Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্দশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖ডিসেম্বর ২০২৪

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নোবেল পুরস্কার, ২০২৪

সম্পাদকীয় ঃ 'বিজ্ঞান প্রসার' বন্ধ করে দিল ভারত সরকার

সমাজ দর্পণ ঃ যুক্তিবাদী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ-এর খুনিদের জামিন

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ঘূর্ণিঝড় কি মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে ... ?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ বিজ্ঞান মিত্র : শিশির কুমার মিত্র

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ৩
◆কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নোবেল পুরস্কার, ২০২৪

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ৬
◆গৌরী লঙ্কেশ-এর খুনিদের জামিন মঞ্জুর

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ৭
◆ঘূর্ণিঝড় কি মনুষ্যজনিত...বেড়ে চলেছে?

◈ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৩
◆বিজ্ঞান মিত্র : শিশির কুমার মিত্র

◈ গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান চর্চা ঃ ১৬
◆আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার

◈ বিশেষ রচনা ঃ ২০
◆অভয়ার ভয় নাই – রাজপথ ছাড়ি নাই!
◆অভয়ার বিচারের ... জনতার প্রতিক্রিয়া

◈ বিজ্ঞানের খবর ২৬

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ২৮
◆অনেক সময় শসা তেতো হয় কেন?
◆মহাবিশ্বের সব কিছু স্থির না হয়ে গতিশীল কেন?

◈ চয়ন ঃ ৩০
◆আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম – মেঘনাদ সাহা

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩৪
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৮

◈ কবিতা ঃ ৩৯
◆দ্রোহ

সম্পাদকীয় ঃ

‘বিজ্ঞান প্রসার’ বন্ধ করে দিল ভারত সরকার

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর স্বশাসিত সংস্থা ‘বিজ্ঞান প্রসার’ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মহিলা, প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাগে সক্ষম মানুষ, আদিবাসী সমাজ তথা ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন দিককে পৌঁছে দেওয়া, জনপ্রিয়করণ এবং জনসাধারণের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রসার। সংস্থার কর্তারা অতীতে জানিয়েছেন যে দেশের সাত শত’র অধিক জেলাতে এই সংস্থা ছাত্রযুব ও মহিলাদের মধ্যে কাজ করত। কার্যক্ষেত্রে এই সরকারি কর্মসূচি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রমজীবী জনতার মধ্যে কি পরিমাণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলো পৌঁছে দিত তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকলেও তাকে ভারত সরকার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১২ই নভেম্বর ২০২৪ একটি রেসোল্যুশন নিয়ে তাকে পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানায়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুসারে নভেম্বর ২০২৪ থেকে এই সংস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান প্রসার ওয়েবসাইটও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারত সরকার দ্বারা ‘বিজ্ঞান প্রসার’ বন্ধের ঘটনা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এর আগে শতাব্দী প্রাচীন বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস। বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষের কাছে এ এক অশনি সংকেত।

একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গভীর অন্ধকারময় অতীতে নিয়ে যাওয়ার লাগাতার অপচেষ্টা চলছে। জনমানসে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তথা বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রসারের বদলে ভাববাদী সংস্কৃতির পাঁকে নিমজ্জিত করার লাগাতার প্রয়াস অব্যাহত। এর আগে আমরা দেখেছি আইআইটি মান্ডিতে ‘পুর্নজন্ম’, ‘মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে নিজের শরীরের বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা’ এবং ‘সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শরীরের ধারণা’ প্রভৃতি বিষয়ে ৬ মাসের একটি আবশ্যিক কোর্স সকল পড়ুয়াদের জন্য স্থির করা হয়েছে। ‘প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা’র (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বা আইকেএস) নামে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে যেসব নতুন অপবিজ্ঞানের বিষয় যুক্ত হয়েছে এটি তারই অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এইসব বিষয় ছাত্রদের পড়ানোর জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চলছে দেশের সর্বত্র। এই আইকেএস কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচার প্রসারে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বৈদিক

➔

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নোবেল পুরস্কার, ২০২৪

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগে নোবেল পুরস্কার প্রদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের কোন অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে তা জানার আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি ও বর্তমানে কোন স্তরে তা বিকশিত হয়েছে সেই বিষয়ে দু-এক কথায় জেনে নেওয়া দরকার।

বর্তমান যুগকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও প্রয়োগের যুগ হিসাবে অভিহিত করা হলে ভুল হবে না। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এক রকম অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের সূচনা হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে যখন বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণ করা শুরু করেন ও মস্তিষ্কের কর্ম কৌশলকে অনুধাবন করে তা কম্প্যুটারে স্থাপন করার প্রয়াস রাখেন। উদ্দেশ্য হল কম্প্যুটারকে প্রশিক্ষিত করে যন্ত্র মেধার ক্রমশঃ বিকাশ ঘটানো ও তার থেকে নির্ভুলভাবে আরও বেশি বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া। এক সময় 'সুপার কম্প্যুটার' ও রোবটের ধারণা যা কেবল কল্প-বিজ্ঞানের লোমহর্ষক কাহিনী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, আজ তা ঘোরতর বাস্তব। বিজ্ঞানের এই অসামান্য সাফল্য সম্ভব হয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতিকে নিবিড়ভাবে জানার মধ্য দিয়ে। মস্তিষ্ক, পরিবেশ থেকে তথ্যসমূহ (অভিজ্ঞতা) সংগ্রহ করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের

➔

● *সম্পাদকীয়'র শেষাংশ*

গণিত, প্রাচীন অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, মেডিসিন কোর্সে ধ্যান-যোগব্যায়াম ইত্যাদির প্রচলন এবং রামসেতু যে প্রাকৃতিক নয় মনুষ্যসৃষ্ট (ভগবান রামের বানরসেনা দ্বারা প্রস্তুত) ইত্যাদি 'বৈজ্ঞানিক' (!) গবেষণার জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এইভাবে লাগাতার বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিজ্ঞানের নামে চালানোর অদ্ভুদ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা দেখছি সরকারি বিজ্ঞান সংস্থা রকেট উৎক্ষেপণের আগে মন্দিরে পূজো দিচ্ছে। 'ভূতবিদ্যা' বিষয়ে এবছর ছয়মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করেছে প্রখ্যাত 'বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটি'। এই কোর্স চালু করা হয়েছে BAMS এবং MBBS অর্থাৎ আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য। এইসব অপবিজ্ঞান ও অলৌকিক বিষয় পড়ে ভাবীকালের ডাক্তাররা নাকি মনোচিকিৎসায় তার প্রয়োগ ঘটাবেন! এমনকি যেসব অসুখ কি কারণে হয় বলে আজও জানা যায় নি তার নিরসনেও ভূতবিদ্যার জ্ঞান ব্যবহৃত হবে! এ নাকি জনগণের ভালোর জন্য এক গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত!

গণতান্ত্রিক মনোভাব স্বাধীন মতপ্রকাশ, বিতর্ক, ভিন্ন মত হওয়ার অধিকার এবং অবাধ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য আবশ্যিক। কিন্তু দেশে কি বিজ্ঞানচর্চার এই পরিবেশ আছে? বিজ্ঞান মনন তৈরিতে কি সরকার আদৌ আগ্রহী? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষা, নারীর সম্মান ও সুরক্ষা সবদিক থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আজ ভূলুণ্ঠিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গভীরভাবে বিপন্ন। সর্বসাধারণের মধ্যে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। সংবিধানের ৫১এ(এইচ) ধারা, যা বিজ্ঞান মানসিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও মানবতার বিকাশকে কর্তব্য হিসাবে তুলে ধরে, তা আজ ভারত রাষ্ট্র প্রহসনে পরিণত করে ফেলেছে।

এদেশে নানান অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে; এখন আবার রাষ্ট্র কর্তৃক অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের প্রসার বিজ্ঞানের প্রসারের থেকে ভারী হচ্ছে। সমাজের মধ্যকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণে যেখানে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দেওয়া ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বেশি বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সেখানে ৩৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমর্থন করতে পারে কি? না, তা সমর্থন করা যায় না।

আসলে রাষ্ট্র মনে করে জনতার মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা বাড়লে, বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে মানুষের অনুসন্ধিৎসা বাড়বে, তারা সচেতন হবে, বিশ্বাসের নয় বিজ্ঞান ও যুক্তির পথ বেছে নেবে, অধিকার সচেতন হবে, সবকিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে প্রশ্ন তুলবে। বর্তমান শোষণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে এটা কাঙ্খিত নয়। বিজ্ঞান প্রসার কেন্দ্র স্থায়ীভাবে বন্ধ করে অলৌকিক ও ভাববাদের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি এই কারণেই হচ্ছে। সুতরাং সরকারের বিজ্ঞান বিরোধী কার্যকলাপের শুধুমাত্র মৌখিক বিরোধিতার মধ্যে আমাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কর্তব্য এর স্বরূপ উন্মোচন করে বিজ্ঞান আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। ■

(চোখ, নাক, কান, জিহ্বা ও ত্বক) অর্থাৎ দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্বাদ ও স্পর্শের মাধ্যমে। এই সংগৃহীত তথ্য ভান্ডার মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজন পড়লে মস্তিষ্ক সেই তথ্য পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও কোন নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, কেউ একটি শিশুকে প্রথমবার যখন কোন বিড়ালের সঙ্গে পরিচয় করান, বিড়ালের অবয়ব দেখে, বিড়ালের ডাক শুনে বা বিড়াল স্পর্শ করে বিড়াল সম্বন্ধে একটি তথ্য ভান্ডার সংগৃহীত হয় যা শিশুটির মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কক্ষে সংরক্ষিত হয়। যিনি শিশুটিকে বিড়ালের সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন প্রাথমিকভাবে তিনি হলেন প্রশিক্ষক। পরবর্তীকালে ঐ শিশুটি যখন আবার বিড়াল দেখে সে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিড়াল চিনতে পারে। এই পর্যায়ে শিশুটির মস্তিষ্ক আগের সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে কেবলমাত্র বিড়াল সংক্রান্ত স্মৃতি ভান্ডারটি উত্তেজিত করে ও বিড়াল চিনতে সাহায্য করে প্রশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই। বিভিন্ন রঙের বা বিভিন্ন আকারের বা বিভিন্ন প্রজাতির বিড়ালের সংস্পর্শে এলে বিড়াল সম্বন্ধে ধারণার আরও ব্যাপ্তি ও বিশেষীকরণ ঘটে। কেবলমাত্র বিড়ালের ডাক শুনেই বিড়ালের উপস্থিতি বোঝার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় ও শিশুটি ধীরে ধীরে বিড়ালের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীকে পৃথক করতে সক্ষম হয়। তথ্য ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হলে এমনকি বিড়াল গোত্রের একই রকম দেখতে সদস্যদের যথা, বাঘ, চিতা, জাগুয়ার, পুমা ইত্যাদিকে পৃথকভাবে সনাক্ত করতে শেখে। একজন মানুষ যত বেশি বস্তুমন্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে বা সংস্পর্শে আসে তার মস্তিষ্কে তথ্য ভান্ডারের আয়তন তত বেশি হয়। যে মানুষের মস্তিষ্ক ঐ সংরক্ষিত তথ্যাবলী পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করতে পারে ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে মেধাবী বলা হয়। মানুষকে কোন নির্দিষ্ট কাজে পারদর্শী করে তুলতে হলে দরকার সঠিক প্রশিক্ষণের। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন ও সফল হয়েছেন। মস্তিষ্কের মধ্যে অবিরত ঘটে চলা জৈব-রাসায়নিক কর্মকান্ডের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া কৌশল রপ্ত করার পর তা যন্ত্রের (গাণিতিক) পরিভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে কম্প্যুটারে স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যন্ত্রকে কোন নির্দেশ দিলে যন্ত্র সেই আজ্ঞা পালন করে। মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক ও যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যকার মূল পার্থক্য হল, মস্তিষ্কের ভিতর স্নায়বিক উদ্দীপনার আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন অজৈব আয়ন ও কিছু জৈব অণু কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দায়ী একমাত্র ইলেক্ট্রন প্রবাহ। মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ যন্ত্রে মেধার বিবর্তন ঘটিয়েছে।

মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশের নিয়ম যন্ত্রমেধা বিকাশের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রকে প্রশিক্ষিত করার এই পদ্ধতি শুরু হয় ডেটা অ্যানালিসিস বা তথ্য বিশ্লেষণ বিশেষতঃ গাণিতিক হিসাব নিকাশ করার ক্ষমতা তৈরী করার মধ্য দিয়ে। যার বিকাশের এক স্তরে এসে যন্ত্র প্রবেশ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের এক স্তর হল 'মেশিন লার্নিং'। যে স্তরে পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করে মানুষের চাহিদা পূরণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আজকাল কোন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে ঐ বিষয়ে কয়েকটি শব্দ টাইপ করলে বা মুখে উচ্চারণ করলেই এক লহমায় তা কম্প্যুটারের পর্দায় ভেসে ওঠে। এ সবই সম্ভব হচ্ছে মেশিন লার্নিং-এর দৌলতে। এছাড়া অনলাইন জালিয়াতি সনাক্তকরণ, রোগ নির্ণয়, অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী, ভাষা সনাক্তকরণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি বহু বিষয়ে মেশিন লার্নিং-এর প্রয়োগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিশে গেছে। যন্ত্রে ব্যবহৃত কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-এর বিকাশের পথ ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে মেশিন লার্নিং থেকে বিকশিত হয়ে ডিপ লার্নিং যুগ অতিক্রম করে জেনারেটিভ লার্নিং যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ গণিতের পরিভাষায় বলতে গেলে, মেশিন লার্নিং হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপসেট, ডিপ লার্নিং হল মেশিন লার্নিং-এর উপসেট আবার জেনারেটিভ লার্নিং হল ডিপ লার্নিং-এর উপসেট।

জেনারেটিভ লার্নিং-এর দৌলতে যন্ত্র হয়েছে অনেক পরিণত। মানুষের ভাষাগত ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চাহিদা পূরণ করতে শিখছে। গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্র, ক্রেতা পরিষেবা, ত্রিমাত্রিক ছবি সৃষ্টি, পরিবহন ক্ষেত্র, ড্রাগ শিল্প সহ বহু ক্ষেত্রে এর

প্রয়োগের পাশাপাশি আজকের চ্যাট জিপিটি, চ্যাটবট ইত্যাদি যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশেরই ফসল। যন্ত্রমেধার ধারাবাহিক প্রয়োগের ফলে মানুষের শ্রমলাঘব ঘটেছে।

বর্তমান সমাজে একদিকে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ আর অন্যদিকে সমাজের সিংহভাগ মানুষের কর্মহীনতার ফলে সৃষ্ট দারিদ্রের ছবি সর্বত্র দৃশ্যমান। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বিজ্ঞানের এই বিকাশ সামাজিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলছে বা ভবিষ্যতে কি কি প্রভাব ফেলতে পারে? মানুষ কি যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি দাস, নাকি সৃষ্টিকর্তা? মানুষের এই ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্র নির্ভরতা মনুষ্য জাতির কি চরম বিপদ ডেকে আনবে? মানুষের সৃষ্টিশীলতা কি ধ্বংসের মুখোমুখি? এর শেষ কোথায়? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এই রকম আরও শত শত প্রশ্নের সম্মুখীন আজ সমগ্র মানবজাতি। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর খোঁজা আজ সময়ের দাবি। তবে তা অবশ্যই অন্য কোন পরিসরে।

এখন আমরা জেনে নেব ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নোবেল পুরস্কার কোন কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্য প্রদান করা হল।

পদার্থ বিজ্ঞান – কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শক্তিশালী মেশিন লার্নিং-এর ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এই বছর পদার্থ বিজ্ঞানে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন দুই বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন, আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড এবং কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী জিওফ্রে ই হিনটন। মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ঐ দুই বিজ্ঞানী কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক-এর একটি কাঠামো (হিডন ইউনিট) গঠন করেছেন যা একদিকে তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে পারে আবার অপরদিকে ঐ তথ্য ভান্ডার বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করতে কম্প্যুটারকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। কোন বিষয়ে তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ব্যাতিরেকেই কেবলমাত্র ব্যবহারিক গুণাবলী সংক্রান্ত কিছু তথ্যের সাহায্য নিয়েই এই কাজ সমাধা করা সম্ভব। গত চার দশকের বেশি সময় ধরে এই দুই বিজ্ঞানীর সম্মিলিত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা যন্ত্রমেধার প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে।

রসায়ন – এবছর তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সে। এঁরা হলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার। বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার কম্প্যুটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনিং বা গণনামূলক পদ্ধতিতে প্রোটিনের গঠন জানার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানী ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার মেশিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে প্রোটিন অণুর গঠন কি হতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। মানুষের শরীর প্রায় চার লক্ষাধিক প্রোটিনের আধার। জীবদেহের সঠিক জৈবিক তত্ত্বাবধানের জন্য প্রোটিন অণুর ভূমিকা বিশাল। প্রোটিন একাধারে অক্সিজেন বাহক, উৎসেচক, হরমোন, রোগ প্রতিরোধক অন্যদিকে কোষের গঠনগত একক, কোষের রক্ষাকর্তা। সেই কারণে প্রোটিনের গঠন নির্ণয় বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে, আগামীদিনে জেনেটিক্স, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, ড্রাগ প্রস্তুতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রের অগ্রগতি ঘটবে।

শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান – দুই মার্কিন জীব বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যাম্ব্রোজ ও গ্যারী রুভকুন মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা উদ্ঘাটনের জন্য এই বছরের নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এই আবিষ্কারের বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে কোষের অভ্যন্তরে ঘটে চলা প্রোটিন সংশ্লেষ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। বহুকোষী জীবের দেহে প্রতিটি কোষের ক্রমোজমে অভিন্ন ডিএনএ থাকে। অর্থাৎ পেশীকোষে যে ডিএনএ থাকে স্নায়ুকোষেও থাকে একই ডিএনএ। এই ডিএনএ অণুগুলির নির্দিষ্ট স্থানে থাকে অসংখ্য জিন। জিনগুলি হল নির্দিষ্ট প্রোটিনের সংকেত। প্রোটিন সংশ্লেষকালে একটি জিন তার প্রতিলিপি তৈরী করে যাকে বলা হয় এম-আরএনএ। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এম-আরএনএ-র সাংকেতিক ভাষাকে প্রোটিনের ভাষায় রূপান্তর ঘটায় রাইবোজোম। অর্থাৎ রাইবোজোম অনুবাদকের কাজ করে ও ভিন্ন ভিন্ন এম-আরএনএ-র নির্দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সংশ্লেষ করে। পেশী কোষগুলি পেশীকোষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনগুলিই কেবল তৈরী করে। স্নায়ুকোষ, অন্ত্রকোষ ও অন্যান্য কোষের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে একই ঘটনা। কিন্তু প্রশ্ন হল একই জিন থেকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষ না হয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন তৈরি হয় কিভাবে? এর উত্তর নিহিত আছে জিন নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়া কৌশলের ভিতর। এই কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কয়েক হাজার জৈব অণু। মাইক্রো আরএনএ হল এদের অন্যতম। তাই মাইক্রো আরএনএ-র আবিষ্কার কোষবিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুকোষী জীবের দেহে জিন নিয়ন্ত্রণের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে আরো সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য এই আবিষ্কার কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ■

সমাজ দর্পণ ঃ

যুক্তিবাদী সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ-এর খুনিদের জামিন মঞ্জুর – উল্লাসে হিন্দুত্ববাদীরা

গত ৯ই অক্টোবর ২০২৪, বেঙ্গালুরু সেশন কোর্ট যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত ৮ ব্যক্তি অমল কালে, রাজেশ ডি বাঙ্গেরা, পরশুরাম ওয়াঘমোর, গণেশ মিসকিন, অমিত বাদ্দি এবং মনোহর ওয়াদে'কে জামিনে মুক্তি দেয়। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কর্ণাটক হাইকোর্ট ওই খুনের মামলায় অভিযুক্ত জন্য ৪ জন – ভারত কুরানে, শ্রীকান্ত পাঙ্গারকার, সুজিত কুমার এবং সুধন্যা গন্ধেলকর এর জামিন মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রবীণ নির্ভীক সাংবাদিক শ্রীমতী গৌরী লঙ্কেশ ছিলেন 'লঙ্কেশ' পত্রিকার সম্পাদক এবং তাকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়ির সামনে দুইজন মটর সাইকেলে চড়ে আসা আততায়ীরা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

ঐ সময় রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম (সিট) সর্বমোট ১৮ জন অপরাধীকে চিহ্নিত করেন। এদের মধ্যে সিট তদন্তকারী সংস্থা অমল কালে-কে খুনের প্রধান পরিকল্পনাকারী (মাস্টার মাইন্ড) হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ঐ মোটর সাইকেল চালক গণেশ মিসকিন এবং গুলি চালনাকারী পরশুরাম ওয়াঘমারে-কে প্রধান খুনি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যদানের পরিপ্রেক্ষিতে। অভিযুক্তকারীরা ভারতীয় দন্ডবিধির বিভিন্ন ক্রাইম অ্যাক্টে বিচারাধীন ছিল।

উক্ত জামিনের পর কর্ণাটকের বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী গৌরী লঙ্কেশকে মোটর বাইকে চেপে এসে গুলি করে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত গণেশ মিসকিন এবং পরশুরাম ওয়াঘমোরে-কে বিশেষ সম্বর্ধনা দেয়।

উক্ত দুই ব্যক্তিকে বিজয়পুরা অঞ্চলের কালিকাদেবী মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূজা দেওয়া হয় এবং মাল্যদান করে বীরের সম্মান দেওয়া হয়। স্লোগান ওঠে 'ভারত মাতা কি জয়'। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় যে হিন্দুত্ববাদী নেতা উমেশ ভ্যান্ডাল উক্ত অনুষ্ঠানে দুই অভিযুক্তকে শাল এবং মালা পড়িয়ে দেন। নীলকান্ত কান্ডাগাল, অন্য একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শ্রীরাম সেনা'র নেতা, উক্ত অনুষ্ঠানে দাবি করেন যে অভিযুক্তকারীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। স্থানীয় বিভিন্ন মিডিয়া দুই অভিযুক্তকারীদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকার করে।

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের হামলার প্রথম শিকার গৌরী লঙ্কেশ নন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তিবাদী নেতা নরেন্দ্র দাভোলকরকে

মহারাষ্ট্রের পুণাতে হিন্দুত্ববাদীরা গুলি করে হত্যা করেছিল। বিচারের দীর্ঘকালীন প্রহসনের পর প্রকৃত অপরাধীদের ছেড়ে দিয়েছে আদালত। ঐ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে গোবিন্দ পানেসরকেও হিন্দুত্ববাদীরা গুলি করে হত্যা করে। মুক্তমনা ইউ. আর. অনন্তমূর্তি এবং এম এম কালবুর্গীকে হত্যা করার পর বজরঙ দলের এক কর্মী টুইটারে গর্ব করে বলেছিল "হিন্দুধর্মকে উপহাস করো আর কুকুরের মত মরো।"

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশাকারী ব্লগারদের উপর হামলা এবং একের পর এক হত্যা এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য করার সঙ্গে ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের কার্যকলাপের কার্যত কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বের সর্বত্র জিওনবাদী, খ্রিস্ট-বৌদ্ধ-ইসলাম-হিন্দু ইত্যাদি মৌলবাদীদের ভূমিকারও কোন পার্থক্য নেই। মৌলবাদীদের কাছে বিজ্ঞান মনস্ক জনতা এর বদলে অন্য কিছু আশা করেন না। কিন্তু দেশের মানুষের একটা বড় অংশের (এমনকি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরও বড় অংশ) এখনও আদালত ও বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় মিলবে এমন আশা করে থাকেন। শোষণমূলক এই সমাজ ব্যবস্থায় শোষক-শাসকশ্রেণী তার শোষণ শাসন নীতি জারি রাখতে যুক্তি বা বিজ্ঞান নয়, অন্ধত্ব এবং মৌলবাদকেই প্রশ্রয় দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় ন্যায়ালয়ে যেমন ন্যায় মেলে না, তেমনি অন্যায়কারীরাই পূজিত হয়। ■

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

ঘূর্ণিঝড় কি মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে বেড়ে চলেছে?

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্রে নানা ভৌগোলিক পরিবেশে নানা প্রকার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে সংলগ্ন উপকূলে ঝড় ও প্লাবনের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকার নানা দেশে, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে নিরক্ষীয় (Tropical) জলবায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় হয় বলে একে নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন (Tropical Cyclone) বলা হয়। (চিত্র-১ ম্যাপ) পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসেও ঘূর্ণিঝড়ের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাচীন প্রস্তরখন্ডে। অতীত যুগের সাইক্লোনকে যে বিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করা হয় তাকে Palaeotempestology (প্যালিও টেমপেস্টোলজি) বিদ্যা বলা হয়।

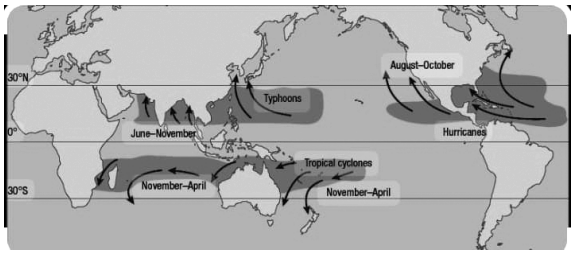

চিত্র-১ ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের মানচিত্র

ঘূর্ণিঝড়ের বিজ্ঞান

নিরক্ষীয় বা ট্রপিক্যাল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার (Equatorial Line) মোটামুটি ৫° উত্তর থেকে ৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে। বিশেষত ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোনে (Inter Tropical Convergence Zone) যেখানে দুই গোলার্ধের বায়ুপ্রবাহ একটি জায়গায় মিলিত হয়। গভীর সমুদ্রে এই স্থান সুনির্দিষ্ট নয়। মুখ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সূচনা বিন্দুর পরিবর্তন হয়। তবে দীর্ঘ গবেষণায় জানা গেছে যে বঙ্গোপসাগরে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি।

এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে সমুদ্রের গভীরে সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপের পর সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনগুলির একটা বড় অংশ সমুদ্রের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়, উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে না।

আবহবিজ্ঞানের ভাষায় সাইক্লোন হল একটি বদ্ধ, চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান তরল (ফ্লুইড) এর গতি। একটি সর্পিল জলীয় বাতাস পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। আবহবিজ্ঞানের মতে মুখ্যত ৭টি ভৌগোলিক শর্তের সমাপতন হলে তবেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এগুলি হল ঃ

১) সমুদের জল উষ্ণ হয়ে ওঠা – সমুদ্রের জলের ১৫০ ফুট (৪৬ মিটার) গভীরের তাপমাত্রা অন্ততপক্ষে ৮০° ফারেনহাইট বা ২৭° সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। এই উষ্ণতাই সাইক্লোনের শক্তির উৎস।

২) আবহাওয়ায় অস্থিরতা সৃষ্টি – ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে গেলে সমুদ্রতল থেকে বায়ুমন্ডলের যত উপরে ওঠা যাবে তত তা দ্রুত ঠান্ডা হওয়া প্রয়োজন জলীয় বাষ্পের পরিচলন (Convection) এর জন্য।

৩) নিচু উল্লম্ব বায়ুশিয়ার (Low Vertical Wind Shear) – উল্লম্ব বায়ুশিয়ার অর্থাৎ উচ্চতার পরিবর্তনের সাথে বায়ুর গতি বা দিক পরিবর্তন নিচু হওয়া প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে গেলে বায়ুমন্ডলের উচ্চ ট্রপোস্ফিয়ারে উল্লম্ব বায়ুশিয়ার ৩৭ কিমি/ঘন্টার কম হওয়া প্রয়োজন।

৪) বায়ুমন্ডলে উচ্চমাত্রায় আর্দ্রতা – ট্রপোস্ফিয়ারের নিচু থেকে মাঝারি স্তরে উচ্চ মাত্রায় আর্দ্রতার প্রয়োজন।

৫) কোরিওলিস বল – নিম্নচাপের কেন্দ্র সৃষ্টি হতে যথেষ্ট পরিমাণ কোরিওলিস বলের প্রয়োজন।

৬) বায়ুমন্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারের ৭ কি.মি এর মধ্যে বায়ুপ্রবাহের অভিন্নতা প্রয়োজন।

৭) উচ্চ এবং মধ্য ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যে শক্তিশালী উল্লম্ব সংযোগ (strong vertical coupling) প্রয়োজন।

গতিবেগের নিরীখে ঘূর্ণিঝড় ৭ প্রকার – ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণীবিভাগ

	গতিবেগ
লো প্রেসার এরিয়া (নিম্নচাপ)	৩১ কিমি/ঘন্টার কম
ডিপ ডিপ্রেসন (গভীর নিম্নচাপ)	৩১-৪৯ কিমি/ঘন্টা
ডিপ ডিপ্রেসন (অতিগভীর নিম্নচাপ)	৫০-৬১ কিমি/ঘন্টা
সাইক্লোনিক স্টরম (ঘূর্ণিঝড়)	৬২-৮৮ কিমি/ঘন্টা
সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টরম	

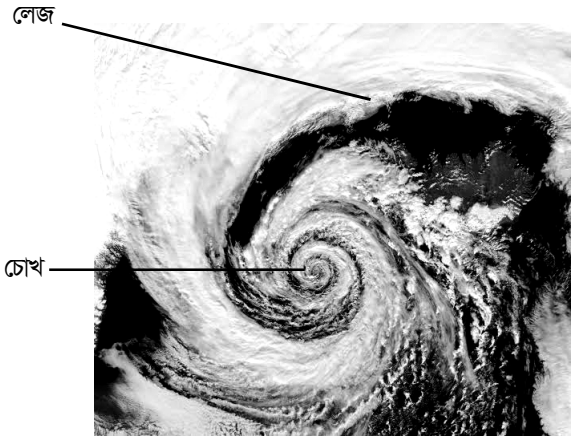

চিত্র-২ সাইক্লোনের আকৃতি

চিত্র-৩ বঙ্গোপসাগরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও আকৃতি

(মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়)	৮৯-১১৮ কিমি/ঘন্টা
ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টরম	
(খুব মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়)	১১৯-২২১ কিমি/ঘন্টা
সুপার সাইক্লোন	২২২ কিমি/ঘন্টার বেশি

সাইক্লোনের আকৃতি ও প্রকৃতি –

একটি সাইক্লোনের ব্যাস ১০০-৮০০ কিমি অবধি হতে পারে। সাইক্লোনিক স্টরম এর সময় বায়ুপ্রবাহ হয় কেন্দ্রের দিকে এবং বায়ুর চাপ হয় সর্বনিম্ন (সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টরম এর সময় ৫০-৬০ হেক্সা পাস্কেল)। সাইক্লোনের সময় ঝড়ের উচ্ছাস (Storm Surge) যুক্ত হয়। ঝোড়ো বাতাস বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে এবং তার লীনতাপ সাইক্লোনের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। স্যাটেলাইট চিত্রে চোখে পড়ার মত দিক হল তার **চোখ** (eye)। এই চোখ হল সবথেকে উষ্ণ অঞ্চল। সাইক্লোনের চোখ যত বেশি উষ্ণ হয়, তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা তত বেশি হয়। এই চোখের কাছে বাতাসের গতিবেগ সবথেকে কম (২৫-৩০কিমি/প্রতি ঘন্টা) এবং এখানে কার্যত কোন বৃষ্টিপাত হয় না এবং সাইক্লোনের পরিধি অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ সর্বাধিক। সাইক্লোনের সাথে অনেক সময় একটি **লেজ** (tail) থাকে অনেকগুলি ব্যাস নিয়ে। সমগ্র সাইক্লোন সর্পিল আকারের এবং **কমা** (comma) আকৃতির হয়। লেজ সাইক্লোনের প্রধান অংশ মহাদেশে ঢোকার অনেক আগেই উপকূলের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টিপাতের সূচনা করতে পারে। একটি সাইক্লোনের জন্ম থেকে বিলয়ের সময়কাল ৭-১০ দিন এবং এর প্রভাবে ২৫-৩০ সেমি অবধি বৃষ্টিপাত হতে পারে। মহাদেশে প্রবেশের আগেই সাইক্লোনের লয় শুরু হয় কারণ তখন থেকেই সে জলীয় বাষ্পের উৎস হারায়। [চিত্র-২]

বঙ্গোপসাগরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও ফানেল আকৃতির [চিত্র-৩] (পূর্বঘাট পর্বতমালা ও আরাকান পর্বতমালার মধ্যবর্তী) জন্য এখানে সাইক্লোন প্রথমে উত্তরপশ্চিমমুখী থাকলেও পরে সাধারণত পূব দিকে ঘুরে যায়। যদিও এই প্যাটার্ন সব সময় মেলে না। অধিকাংশ সময় সাইক্লোনের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রের জলোচ্ছাস (১২ মিটার অবধি) দেখা যায়। সাইক্লোন পাড়ে আছড়ে পরবার সময় বড় জোয়ার (অমাবশ্যা/পূর্ণিমায় ভৌগোলিক কারণে) বা সুনামি (মুখ্যত ভূমিকম্পের মত ভূতাত্ত্বিক কারণে) দেখা দিলে জলোচ্ছাস আরও বড় মাত্রায় হয়। যেমন ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলায় সুনামির সাথে সাইক্লোনের সমাপতনের ফলে রেকর্ড জলোচ্ছাস সমগ্র কলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়ার বড় অংশে প্লাবন ঘটিয়েছিল। আবহ বিজ্ঞানীরা এটাও সুনির্দিষ্ট করেছেন যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় বর্ষার আগে (এপ্রিল-মে মাসে) এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) প্রধানভাবে হয়।

মনুষ্যজনিত ভূ-উষ্ণায়ণের কারণে কি সাইক্লোন বাড়ছে?

পরিবেশবাদীদের দ্বারা মনুষ্যজনিত কারণে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের দাপট ও সংখ্যা বৃদ্ধির কথা লাগাতার প্রচার হচ্ছে। বলা হচ্ছে মনুষ্যজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ছে। মানুষ যদি এই বিষয় সচেতন না হয় তবে আগামী পৃথিবীতে সমগ্র সমুদ্র উপকূলবাসীর জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে এবং বহু জৈব প্রজাতি ধ্বংস হবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকেও এই প্রসঙ্গে লেখা হচ্ছে। সকল মিডিয়ায় এই প্রচার উত্তোরত্তোর বাড়ছে।

এই প্রসঙ্গে আবারও বলা দরকার এই পৃথিবীতে মানুষের

আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই নানা প্রকার ঘূর্ণিঝড় ঘটে আসছে। ভূবিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করেছেন।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পৃথিবীতে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এর হিসাব পাওয়া যায়। ১৭০০-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানতঃ আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে (বিকশিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে) আবহবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাতের কারণে সেখানকার তথ্য পাওয়া যায়। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে আবহবিজ্ঞানের চর্চা অনেক পরে শুরু হয় বলে সেই তথ্য ভান্ডারে এই অঞ্চলের তথ্য খুব বেশি নেই। ১৯৬০-এর দশক থেকে সমগ্র বিশ্বে আবহবিজ্ঞানের দপ্তর গঠন ও কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায়। [Tropical Cyclone by year – Wikipedia en.m.wikipedia.org] ১৯৬৮-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এই ৫৬ বছরের ইতিহাসে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সাইক্লোন ঘটেছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে – ১৫০টি। এই ৫৬ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে সর্বনিম্ন সংখ্যার সাইক্লোন হয়েছে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে – ৯৭টি। বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাইক্লোন হয়েছে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে (১৪৫), দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সাইক্লোন হয়েছে (১০০) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তৃতীয় সর্বোচ্চ সাইক্লোন হয়েছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে (১৪৪), তৃতীয় সর্বনিম্ন সাইক্লোন হয়েছে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে (১০২)।

৫৬ বছর সময়কালকে ৭ বছর অন্তর ভাগ করলে সাইক্লোনের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সাল	সাইক্লোনের মোটসংখ্যা
১৯৬৮-১৯৭৪	৮৪৬টি
১৯৭৫-১৯৮১	৯২৮টি
১৯৮২-১৯৮৮	৮১৪টি
১৯৮৯-১৯৯৫	৮১২টি
১৯৯৬-২০০২	৮৩৬টি
২০০৩-২০০৯	৮৯৮টি
২০১০-২০১৬	৯০১টি
২০১৭-২০২৩	৯৪৩টি

এছাড়া সমগ্র বিশ্বে মোট ট্রপিক্যাল সাইক্লোন (১৯৪৪-২০০০) পর্যায়ে কি হয়েছে তা নিয়ে এক গবেষণায় যে লেখচিত্র পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ (চিত্র-8) [Net Tropical Cyclone Activity during 1944-2000 period (Gray) দ্বারা অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র]। এই লেখচিত্রে সাইক্লোনের Multi Lecadal pattern (বহু দশক ধরে বড় মাত্রার variation) পাওয়া গেছে।

এই তথ্যগুলি কি প্রমাণ করে? দুই শতাব্দী ধরে বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর শিল্প উৎপাদন, নগরায়ন, জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। বিশেষতঃ বিগত ৭০-৮০ বছর ধরে তা সর্বোচ্চ সীমায়

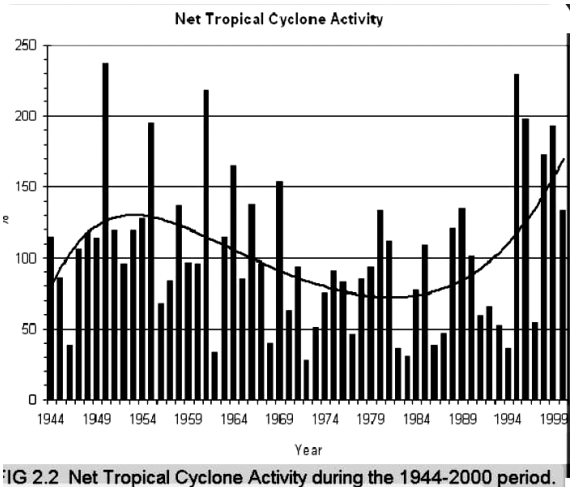

IG 2.2 Net Tropical Cyclone Activity during the 1944-2000 period.
lotice the oscillatory multi-decadal patterns (Gray, unpub).

চিত্র-৪ ১৯৪৪-২০০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি পৃথিবীতে ঘটা সাইক্লোনের লেখচিত্র

পৌঁছেছে। তবুও সাইক্লোনের সংখ্যা দশকের পর দশক কমা বাড়া হয়ে চলেছে কেন? আই পি সি সি তথা চীনা ও বৃটিশ বিজ্ঞানীদের একটা অংশ বলছেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতিবছর ০.৭° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ঘূর্ণিঝড়ও বাড়ছে। কিন্তু পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান এই প্রচারকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে সাইক্লোনের ক্ষেত্রে ৭টি ভৌগোলিক শর্তের সমাপতন হওয়া জরুরি। সমুদ্রের জলের উষ্ণতা শুধুমাত্র বাড়লেই সাইক্লোন হয় না। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র বায়ুমন্ডলের উষ্ণতাবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমুদ্র জলের উষ্ণতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপের প্রবাহ (Heat flow from below the crust) বড় ভূমিকা পালন করে। আগ্নেয়গিরি সারির ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ বরাবর, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল জুড়ে, ভারত মহাসাগরের মাঝ বরাবর, ইন্দোনেশিয়া-জাভা থেকে ভারত মহাসাগরে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিচে রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি। অগ্নুৎপাতের সময় বা অন্য সময়ও এইসব অঞ্চল থেকে ভূঅভ্যন্তরস্থ তাপ সমুদ্র জলকে উষ্ণ করে থাকে। এছাড়া ১৯৪০-এর দশক থেকে পরমাণু শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। পরমাণু গবেষণা, শক্তি উৎপাদন ও বোমা তৈরির কাজে যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হচ্ছে সেই পারমাণবিক বর্জ্য- নিষ্কাষণ প্রধানত হচ্ছে সমুদ্রের গর্ভে। [চিত্র-৫, পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির ম্যাপ]

আই এ ই এ-র সহযোগী রেডিও অ্যাকটিভ কমিশন (OSPAR) ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এক কনভেনশন রিপোর্টে জানায় যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করা হচ্ছে।

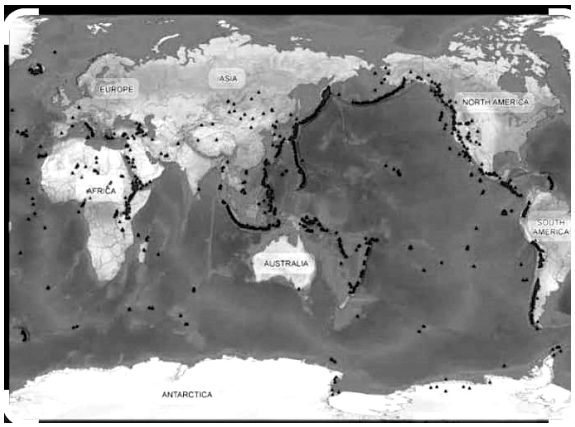

চিত্র- ৫ পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরিগুলির অবস্থান

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এর মাত্রা ছিল ০.০২ পি বি কিউ (Peta Becquerel-রেডিয়েশন মাত্রার একক) এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে এর মাত্রা বেড়ে হয়েছে ৭ পি বি কিউ। বিশ্বের ৮টি দেশ (ইউ এস এ, ইউ কে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড) উত্তরপূর্ব আটলান্টিক সাগরে ৯৩.৫ শতাংশ পারমাণবিক বর্জ্য সমুদ্রে ফেলছে নিয়ম লঙ্ঘন করে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) ফেলছে আর্টিক সাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলছে জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, ইউ এস এ। বেসরকারি সূত্রে জানা যায় যে ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গার্সিয়া অঞ্চলে অনুরূপভাবে এই বর্জ্য ফেলছে ইউ এস এ ও তার সহযোগীরা। ভারতও এই তালিকায় রয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীন।

এইভাবে প্রতিনিয়ত যে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বর্জ্য গভীর সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে তা থেকে অবিরত নির্গত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। এই বিকিরণ যেমন সমুদ্রের জীবজগতের বিনাশে ভূমিকা রাখছে, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে তেমনই সমুদ্রের জলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

চীনা বিজ্ঞানী ফোমিং হাং, জি লিন এবং বিনসিন সেং (২রা ডিসেম্বর ২০১৯) তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বর্জ্য শুধুমাত্র সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বাড়ায় না, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা সমুদ্রতল থেকে নিচের দিকে ফারাক ঘটায় (২.৭৯° সেলসিয়াস থেকে ৪.২৫° সেলসিয়াস)। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কম বিকিরণ করে এমন বর্জ্য (লো লেভেল ওয়েস্ট) থেকে। স্বভাবতই বোঝা যায় যে হাই লেভেল ওয়েস্ট থেকে বিকিরণ ও উষ্ণতা বৃদ্ধি কেমন হয়। যদিও হাই লেভেল ওয়েস্ট এ আই ই এ-র নির্দেশমত যত্রতত্র নিক্ষেপ বে-আইনী। কিন্তু আইনের রক্ষকরা আর আইন ভঙ্গকারীরা কি কার্যক্ষেত্রে পৃথক?

এই সমগ্র আলোচনার পর পরিবেশবাদীদের প্রচার কি পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত বলে বোধ হয়? পাঠকরাই বিবেচনা করবেন।

পাকা বাঁধ নয়, ঝড়-প্লাবন প্রতিরোধের একমাত্র উপায় কি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তার?

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ম্যানগ্রোভ (সুন্দরী গাছ) এর জঙ্গল ছড়িয়ে আছে ১০,২৫০ বর্গ কি.মি অঞ্চল জুড়ে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং উত্তর ও কেন্দ্রীয় মায়ানমার উপকূলে। বিগত ৫০ বছর ধরে বঙ্গোপসাগরে ম্যানগ্রোভ ধাপে ধাপে কমেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে এর বিস্তার ছিল ১,০৩৮ বর্গ কিমি এবং ২০২১-এ তা কমে হয় ৭৭৩ বর্গ কি.মি। গড়ে গত ৫০ বছরে এর পরিমাণ কমেছে প্রায় ৭.৮ শতাংশ হারে। তবে বনসৃজন প্রকল্প চালু হওয়ার পর ম্যানগ্রোভ কমার হার হয়েছে ৪.২৩ শতাংশ।

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরী গাছের পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা সম্পর্কে বিজ্ঞানী বলছেন যে (১) ম্যানগ্রোভ খাড়ি এলাকায় জোয়ার-ভাটার প্রভাব (ভূমিক্ষয় এবং প্লাবন প্রতিরোধ) কমায়। (২) খাড়ি অঞ্চলগুলিতে ভূমিক্ষয় রোধ করে পলি জমতে সাহায্য করে (৩) সাইক্লোন বা অন্য ঝড়কে প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ করে (৪) সুন্দরী গাছের পাতার উপর থাকা মোমের মত স্তর বাষ্পায়নের হার কমায় (৫) ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই অঞ্চলে নানা পশুপাখির আবাসস্থল হয়ে আছে।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সুলতান আমল (১২০৪-১৫৭৫) থেকে অরণ্য কেটে জমি উদ্ধার শুরু হয়। মুঘল আমল (১৫৭৫-১৭৬৫)তে এই প্রক্রিয়া জারি ছিল। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭)। তবুও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রফল ছিল বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ। বিজ্ঞানী ঘোষ এবং তার সহযোগীদের মতে (২০১৫) ১৮৭৩-এর তুলনায় ১৯৬৮-তে মানুষের বসতি স্থাপন ও কৃষির জন্য সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রফল অর্ধেক হয়েছে। যদিও ব্রিটিশ সরকার ও পরে ভারত সরকার বনসংরক্ষণের জন্য নানা আইন জারি করেছে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইউনেসকো ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ আখ্যা দেয়। [সূত্র ঃ Spatio-temporl pattern of change in mangrove populations alnrg the coastal West Bengal, India - Biswajit Mandol, Ashis Kr Saha, Anirban Roy]

পরিবেশবাদীদের এই ম্যানগ্রোভ কমে যাওয়ার তথ্যকে হাতিয়ার করে সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দাদের অভিযুক্ত করে। কিন্তু ইতিহাস দেখায় যে অতীতে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে জমিদাররা (পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত মেদিনীপুরের) তাদের প্রজাদের দিয়ে অরণ্য

চিত্র-৬, নেদারল্যান্ডে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে রাস্তা

উচ্ছেদ করে কৃষি ও বাস্তুজমি উদ্ধার করেছিল। এই প্রক্রিয়া তার আগেও চলত। সাপ-বাঘ-কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে দরিদ্র প্রজারা এই অরণ্য কেটে কৃষিজমি ও বসত জমি উদ্ধার করেছিল। অরণ্য নিধন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।জমিদারদের নির্দেশে বা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা এই কাজ করেছিল। বর্তমানকালে বনজ সম্পদের লোভে এবং টুরিজম শিল্পের জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই কাজে যুক্ত। সরকার ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এই অরণ্য নিধনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, জনগণ নয়।

এখন মূল প্রশ্নে আসা যাক। সুন্দরবন বা উপকূল অঞ্চলে বড় মাত্রার সাইক্লোন এবং প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় কি শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভের বিস্তার?

আমরা এই বিষয় চর্চার জন্য ২টি ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিচার করতে পারি। প্রথম ঘটনা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৯-১০ই অক্টোবর সুপার সাইক্লোন (যাকে কলকাতা সাইক্লোনও বলা হয়)। এই সাইক্লোনের সময়কালে সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য বর্তমানের অন্তত ৪-৫ গুণ বেশি ছিল। শহর কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেও ছিল ম্যানগ্রোভ সহ অন্যান্য অরণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২৬০-২৭০ কিমি/ঘন্টা গতিবেগে সুপার সাইক্লোন ৩ লক্ষ মানুষের জীবন (মনে রাখবেন তখন জনঘনত্ব বর্তমানের দশভাগের একভাগও ছিল না) কেড়ে নিয়েছিল। প্লাবন তৎকালীন কলকাতাকে প্লাবিত করে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী জেলার বড় অংশকে প্লাবিত করে জান-মালের ক্ষতিসাধন করেছিল।

দ্বিতীয় উদাহরণ ২৯শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের বাংলা (বাখেরগঞ্জ) সাইক্লোন। এই সুপার সাইক্লোনে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বিভিন্ন উপকূলীয় জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণাকে সামগ্রিকভাবে প্লাবিত করে ২ লক্ষাধিক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। অথচ সেই সময়ও সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রফল বর্তমানের দ্বিগুণের বেশি ছিল এবং জনসংখ্যা ও বসতি বর্তমানের বহুলাংশে কম ছিল।

সুতরাং ম্যানগ্রোভ অরণ্য ছোটখাট ঝড় বা প্লাবন থেকে কিছুমাত্রায় প্রাকৃতিকভাবে সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারলেও সাইক্লোন, সিভিয়ার সাইক্লোন বা সুপার সাইক্লোন থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারবে না। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হলেও নয়।

ঝড় বা প্লাবনের নিয়ম (বিজ্ঞান) ও গতিপ্রকৃতি বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খাঁড়ি অঞ্চলে নদীবাঁধ বা উপকূলে সামুদ্রিক পাকা বাঁধ নির্মাণ করা ছাড়া প্রতিরোধের অন্য উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ পাওয়া যায় সুন্দরবনের রাক্ষসখালি অঞ্চলে। আয়লা ঝড় (২০০৯) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর নদীর কিছুটা অংশে আংশিকভাবে তৈরি পাকা নদীবাঁধ আমফান ঝড় (২০২০)কে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে এটা আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে অনুসন্ধান করেই জেনেছি।

পরিবেশবাদীরা প্রশ্ন তোলেন কংক্রিটের পাকা বাঁধ নদীকে তার স্বাভাবিক গতিপথে যেতে বাধা দেবে, এতে নদী আরও প্রবল-

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এর জবাবে বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাকা বাঁধ নির্মাণে নদীর ঢাল, জলোচ্ছাস, জোয়ার-ভাটার প্রভাব, বেসিনের চরিত্র, পলি সঞ্চয় হার ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনা করে গড়ে তোলা হয়। বাড়তি জলের চাপ কমানোর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নেদারল্যান্ড দেশটির বড় অংশ সমুদ্রের জলতলের নিচে অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে এখানে সমুদ্রের জল প্লাবন সৃষ্টি করতো। বছরের বড় সময় দেশের মধ্যে নানা আকারের সামুদ্রিক জলাশয় ছিল। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়বার উপায় ছিল না। সমগ্র দেশটির বড় অংশে বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে অসংখ্য ডাইক, বাঁধ (ড্যাম) এবং ফ্লাডগেট তৈরি করে, বহু অঞ্চলে পাম্পিং স্টেশন খুলে জমা জল সমুদ্রে ফেলার ব্যবস্থা করে এমনকি সমুদ্রের তলা দিয়ে সুরঙ্গ করে রাস্তা বানিয়ে (উপরে সমুদ্রের জলে জাহাজ চলার ব্যবস্থা করে) দেশটিকে কার্যত নানা ধরনের প্লাবনমুক্ত করে অত্যাধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হযেছে। (চিত্র-৬, নেদারল্যান্ডে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে রাস্তা) শতাধিক বছর ধরে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগের সুফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষ। এই পাকা বাঁধ, টানেল, ফ্লাডগেট ইত্যাদি নির্মাণ করা কি সঠিক কাজ নয়? বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে প্রকৃতিকে জয় করার কর্মসূচি কি অনুসরণযোগ্য নয়? পরিবেশবাদীরা এই প্রশ্নে কি জবাব দেবেন?

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনমানসে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে কেন?

অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখার মত আবহবিজ্ঞানের জন্মের পর শুরু হয় তার প্রয়োগগত দিক। শুরু হয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস করার প্রক্রিয়া। কৃষি উৎপাদন, সমুদ্র যাত্রা, মৎসজীবী জনতার সমুদ্র বা নদীতে যাত্রা এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ থেকে বাঁচাতে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান যুগে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আবহবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা সকাল থেকে রাত অবধি কেমন থাকবে, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি নিখুঁত পূর্বাভাস করাও বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রয়োগগত ফলাফল দেখে বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা বাড়ছে এবং অলৌকিকত্বের প্রতি আস্থা কমছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস শব্দের অর্থ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নিয়মিত নজরে রেখে তাদের সমন্বিত ফলাফল হিসেবে আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাস পূর্ব থেকে জনসাধারণকে জ্ঞাত করানো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শর্তগুলির সময়ভেদে পরিবর্তন হয়, ফলতঃ ওই শর্তগুলির সমন্বিত ফলাফলের হেরফের হওয়াও স্বাভাবিক। যেমন সাইক্লোনের জন্মের সময়কার শর্তগুলির বিশ্লেষণ করে তার জন্মের স্থানকাল পূর্বাভাস করা হয়। শর্তগুলির একটু হেরফের জন্মের স্থান বা কালের কিছুমাত্রায় পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সাইক্লোনের জন্মের পর তার নিজস্ব গতিবেগ নির্ণয় করা যায় এবং বিভিন্ন শর্তকে মাথায় রেখে গতিপথ সম্পর্কে আভাস পূর্ব থেকে দেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাকৃতিক শর্তগুলির হেরফের ঘটলে গতিপথ এবং পাড়ে পৌঁছানোর সময়কাল ও বায়ুর গতিবেগের হেরফের অনেক সময় ঘটে যায়। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করেন না, বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে আগে থেকে প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটার আভাস দেন। কিন্তু বর্তমানে পূর্বাভাস নিয়েও দুনিয়াজুড়ে চলছে বড় রকমের ব্যবসা। বৃহৎ পুঁজি সংস্থাগুলি জনগণকে পূর্বাভাসের খবর বেচছেন ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই কারণে হাজারো পূর্বাভাস বিক্রির সরকারি/বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বর্তমানে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। জনতাকে আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে আতঙ্কিত করে রাখতে পারলে এই ব্যবসা বেশি লাভজনক হয়। আতঙ্কিত করার জন্য আবহবিজ্ঞানীদের প্রেরিত তথ্যকে রঙে রসে চুবিয়ে (অনেক সময় তিলকে তাল করে) তারা পূর্বাভাসকে ভবিষ্যৎবাণী রূপে পেশ করে। জনতার একাংশ পূর্বাভাসকে ভবিষ্যৎবাণী রূপে বিবেচনা করতে শুরু করে প্রচারের মাহাত্ম্যে। এরপর পূর্ব থেকে দেওয়া আভাস (যাকে বিকৃত করে ভবিষ্যৎবাণীরূপে পেশ করা হয়) না মিললে অনেকে বিজ্ঞানের উপর, বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা হারান। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে গভীর সমুদ্রে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ থেকে সাইক্লোন সৃষ্টি হলেই বহু সময় তা প্রাকৃতিক নিয়মেই উপকূলে আছড়ে না পড়ে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। বিজ্ঞানের নিয়মেই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে আসার বদলে ওড়িশায় যেতে পারে। এই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা চাঞ্চল্যকর খবর বিক্রিকারী মিডিয়া জনগণকে দেয় না, বিভ্রান্ত করে।

শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানেই তাকে বিজ্ঞানসম্মত প্রতিরোধ না করে ঘটনার পর ত্রাণের টাকায় (যা আসলে জনগণের টাকা) 'হরির লুঠ'! লুঠের ভাগ মেলার গন্ধ পেলেই সরকার প্রশাসনগুলি অতিসক্রিয়তা শুরু করছে। জনতাকে আতঙ্কিত করে রাখা তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চ্যানেলগুলির সাহায্যে সঠিক পূর্বাভাসের ধারণা জনতাকে না দিয়ে জনতাকে আবহাওয়ার ঈষৎ রঙ মেশানো ভবিষ্যৎবাণী প্রচারকে সরকার পক্ষও অনুমোদন করে তাদের স্বার্থে।

সুতরাং আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে এই ধরনের পূর্বাভাসের নামে ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা প্রতারিত হওয়া বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাজ নয়। কোন প্রচার শুনে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। ব্যবসায়িক স্বার্থে বিজ্ঞানকে বিকৃত করে করা ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা প্রতারিত না হওয়ার জন্য জনতাকে সচেতন করুন। ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ

বিজ্ঞান মিত্র : শিশির কুমার মিত্র

– পঞ্চানন মন্ডল

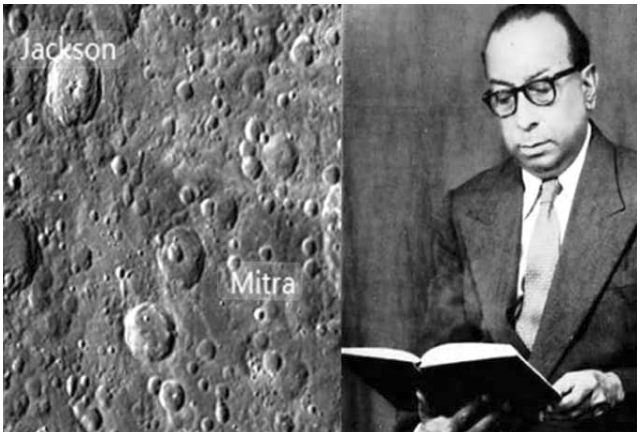

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'র বিখ্যাত চন্দ্রযান-২ মিশন এর কথা আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। দক্ষিণ মেরু প্রান্ত থেকে চাঁদের পৃষ্ঠে রোবোটিক ল্যান্ডার অবতরণের প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট সম্ভাবনাময় প্রকল্প ছিল। কারণ চাঁদের এই অংশটি খুবই এবড়োখেবড়ো আর গর্তে পরিপূর্ণ। বিশ্বের খুম কম দেশই এই ঝুঁকি নেওয়ার কথা কল্পনা করেছিল। যদিও ল্যান্ডারটি সফট ল্যান্ডিং করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তবুও অরবিটার চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে বহু ছবি পাঠাতে থাকে, বিশেষ করে ইমপ্যাক্ট ক্রেটারগুলির, যা বিজ্ঞানীদের চাঁদের ভূখন্ডকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল।

মজার বিষয় হল, অরবিটারের ক্যামেরা চাঁদের যে ক্রেটারগুলিকে বন্দি করেছিল, তাদের মধ্যে একটির নাম একজন বাঙালি বিজ্ঞানীর নামে রাখা হয়েছিল। তা 'মিত্র ক্রেটার' নামে পরিচিত। ৯২ কিলোমিটার ব্যাসের মিত্র ক্রেটার হলো চাঁদের পৃষ্ঠে অবস্থিত একটি বড় গর্ত বা ক্রেটার, যা বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ শিশির কুমার মিত্রের নামে নামকরণ করা হয়েছে। আয়নোস্ফিয়ার এবং বেতার তরঙ্গ নিয়ে ডঃ মিত্রের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি পায় এবং তাঁর এই অবদানের সম্মানে চাঁদের এই ক্রেটারটির নামকরণ করা হয়। মিত্র ক্রেটারটি চাঁদের দূরবর্তী (অদৃশ্য) পৃষ্ঠে অবস্থিত, যার ফলে এটি পৃথিবী থেকে সরাসরি দেখা যায় না। চন্দ্রপৃষ্ঠে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সম্মানে ক্রেটারের নামকরণ করা এক সম্মানজনক ভাবনা, যা বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কে এই শিশির কুমার মিত্র

শিশির কুমার মিত্র এক বঙ্গ সন্তান। বিশ্ব বিখ্যাত এক পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। হুগলির কোন্নগরে। তাঁর মা শরৎকুমারী দেবী ছিলেন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। পরে বিহারের ভাগলপুরে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চিকিৎসক। বাবা জয়কৃষ্ণ মিত্র ছিলেন একজন শিক্ষক। পরে তিনি সপরিবারে ভাগলপুরে চলে আসেন। সেখানকার পুরসভায় করণিক পদে যোগ দেন। তাই ভাগলপুরে শিশির কুমার মিত্রের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয়। ছোটবেলা থেকে তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ শিশির কুমার। যেমন মেধাবী তেমন তাঁর ছকভাঙাতেই আনন্দ।

একবার রামচন্দ্র ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার গড়ের মাঠে বেলুনে চড়ে বসিরহাটে গিয়ে নামেন। এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

"উঠল বেলুন গড়ের মাঠে
নামল গিয়ে বসিরহাটে",

এই ছড়াটা লোকমুখে তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। মাটিতে না নেমে, বেলুন আকাশে উঠছে কী করে? কিসের টানে? এই প্রশ্নে ঝড় উঠেছিল বসিরহাট থেকে অনেক অনেক দূরে ভাগলপুরে সাত বছর বয়সী শিশির কুমারের মনে। শোনা যায় এই খবরেই উৎসাহিত হয়ে ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর আগ্রহী হয়ে ওঠেন শিশির কুমার।

খুব কম দিনের ব্যবধানে তাঁর দুই জ্যেঠু সতীশকুমার ও সন্তোসকুমারের মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি তাঁর বাবা জয়কৃষ্ণ। হার্ট অ্যাটাকে শরীরের একটা অংশ অসাড় হয়ে যায়। ভাগলপুরের হাসপাতালে তখন ডাক্তারি করছেন মা শরৎকুমারী। মাইনে খুব কম। মিত্র পরিবারের দারিদ্র নেমে আসে কিন্তু হার

মানেনি কিশোর শিশিরকুমার। মায়ের অনুপ্রেরণায় এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাগলপুরের টিএনজে কলেজে ভর্তি হন। খুব ভালো নম্বর নিয়ে এফএ পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন শিশিরকুমার।

সেটা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ। প্রেসিডেন্সিতে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। খুলে গেল বিজ্ঞানের এক বিশাল জগৎ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি। তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে গবেষণার সহকারী হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সে সময় গবেষক হিসেবে কোনো বৃত্তি দেওয়া হতো না। তাছাড়া কয়েকমাস পর জগদীশচন্দ্র বসুও অবসর নেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি শিশিরকুমারকে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য ডেকে নেন। আর্থিক নিশ্চয়তার কথা ভেবে অধ্যাপনার আহ্বান গ্রহণ করেন শিশিরকুমার। এরপরেই সি. ভি. রামনের তত্ত্বাবধানে আলোকবিজ্ঞানের উপর কাজ শুরু করেন তিনি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন শিশিরকুমার। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল – 'ইন্টারফিয়ারেন্স অ্যান্ড ডিফ্র্যাকশান অফ লাইট' মানে 'আলোর ব্যতিচার ও বিচ্ছুরণ'।

এরপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের সারবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার সুযোগ আসে শিশিরকুমারের কাছে। এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। এখানে তিনি অধ্যাপক চার্লস ফেব্রির তত্ত্বাবধানে তামার বর্ণালী নিয়ে কাজ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে মেরি ক্যুরির সঙ্গে প্যারিসের রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে এবং পরে অধ্যাপক গুটেনের সঙ্গে প্যারিসের ন্যান্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন শিশিরকুমার। অধ্যাপক গুটেনের সঙ্গে বেতার ভাল্বের গবেষণা করতে করতে বেতার তরঙ্গ নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন। কলকাতায় ফিরে আশুতোষ মুখ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে শিশিকুমার জানান যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার-পদার্থবিদ্যা বা রেডিওফিজিক্স এর পাঠক্রম চালু করা উচিত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে বিদেশ থেকে ফিরে এস ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অধ্যাপনা শুরু করেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট – সি ভি রামন, বেদেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো কিংবদন্তীরা পড়াচ্ছেন।

মূলত শিশিরকুমার মিত্রের হাত ধরে ও উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা সমগ্র ভারতে প্রথম রেডিও-ফিজিক্স বা বেতার-পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পাঠক্রম, পড়াশোনা ও গবেষণা শুরু হলো। তারপরে ভারতে বেতার-সম্প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়েন তিনি। ইতিমধ্যে কলকাতায় সদ্য স্থাপিত 'রেডিও ক্লাব অফ বেঙ্গল'-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে একটি ট্রান্সমিটার বানিয়ে নিজে থেকে সম্প্রচার শুরু করেন। এই সম্প্রচারের নাম দেন তিনি 'রেডিও টু-সি-জেড' (Radio 2CZ)। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত শিশিরকুমার মিত্র এবং রেডিও ক্লাব এই দুটি জায়গা থেকেই বেতার সম্প্রচার হতো।

বিদেশে এই সময় স্যার এপলটন বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। সেই গবেষণার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আয়নোস্ফিয়ার থেকে বেতার তরঙ্গ ফেরে আসতে কত সময় লাগছে তার একটি পরীক্ষা করেন। সম্ভাব্য প্রতিফলক তল আয়নোস্ফিয়ার কিনা তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে। কলকাতায় তাঁর গবেষণাগারে রাখা ট্রান্সমিটার থেকে ৭৫ মাইল দূরে একটি গ্রাহকে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে আয়নোস্ফিয়ারে একটি প্রতিফলক স্তর ধরা পড়ে। এপল্টন ডি-স্তর আবিষ্কার করেছিলেন। শিশিরকুমার নিজ চেষ্টায় ই-স্তর এবং সি-স্তরও আবিষ্কার করে ফেলেন। তাঁরই পরিকল্পনায় ভারতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রেডিও রিসার্চ বোর্ড গঠিত হয়। কলকাতার অনুতিদূরে কল্যাণীর হরিণঘাটায় ভারতের প্রথম আয়নোস্ফেরিক ফিল্ড স্টেশন (IFS) তিনি স্থাপন করেন। বায়ুমন্ডলের উপরে নাইট্রোজেন গ্যাসের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে একটি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। শিশিকুমার পরীক্ষাগারে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই তৈরি করে ফেলতেন। এর ফলে দেশীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তৈরির স্বপ্নও দেখতেন শিশিকুমার।

বিজ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞান সংগঠন গড়ার কাজে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (ISCA)' সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় এই সংগঠনের সম্মেলন আয়োজিত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের বরোদা সমাবেশে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এর পাশাপাশি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS)' এর সম্পাদক, সভাপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন শিশিকুমার মিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার-পদার্থবিদ্যার পাঠক্রম যেমন চালু হয়েছিল, তেমনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে পৃথকভাবে

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বেতার-পদার্থবিদ্যা বিভাগ চালু হয়। মেঘনাদ সাহা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ISNA)'-এর সঙ্গেও বহুদিন যুক্ত ছিলেন শিশিরকুমার। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন।

বায়ুমন্ডলীয় বিজ্ঞানচর্চার উপর তাঁর লেখা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বই 'দ্য আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার'। তাঁর আগে ভারতে কেউই এই বিষয়ের উপর এত গভীর গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান প্রয়োগ করে বই লেখেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বইটি প্রকাশ করার সময় প্রথমে কোনো প্রকাশক এগিয়ে আসেননি। অবশেষে তৎকালীন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেই প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার মিত্রের প্রথম বই। আন্তর্জাতিক স্তরে এই বই পরিচিতি পায়। বহু ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ ভাষায় অনুদিত হয় এই বইটি। রাশিয়ান কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ এর উৎক্ষেপণের আগে একমাত্র শিশিরকুমারের বইটিই রাশিয়ান মহাকাশবিদদের কাছে তথ্যভান্ডার হিসেবে ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পরে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন শিশিরকুমার মিত্র। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে কর্মরত থাকাকালীন উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমে বদল ঘটান তিনি।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

জীবনে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন শিশিরকুমার মিত্র। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কিং জর্জ সিলভার জুবিলি মেডেল, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে জয়কৃষ্ণ মুখার্জি স্বর্ণপদক, ১৯৫৬-তে এশিয়াটিক সোসাইটির সায়েন্স কংগ্রেস পদক লাভ করেছেন শিশিরকুমার। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরের দিকের অবস্থা বিষয়ে গবেষণার স্বীকৃতির জন্য লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন শিশিকুমার মিত্র। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় শিশিরকুমার মিত্রকে। ঐ বছরই ভারতের জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অগাস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞানী ড. শিশিরকুমার মিত্র আজও বিশ্বে একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞানী কারণ তাঁর গবেষণা এবং আবিষ্কারগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আয়নোস্ফিয়ার, রেডিও যোগাযোগ এবং মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর গবেষণা কাজগুলো এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মিত্র আয়নোস্ফিয়ার ঃ

বায়ুমন্ডলের আয়নোস্ফিয়ার নিয়ে তিনি প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ গবেষক ছিলেন। আয়নোস্ফিয়ার হচ্ছে বায়ুমন্ডলের এমন একটি স্তর, যা রেডিও তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে এবং দূরবর্তী যোগাযোগে সহায়ক। ড. মিত্রের গবেষণা আমাদের আয়নোস্ফিয়ারের গঠন কেমন, তার কার্যকলাপ এবং তা রেডিও যোগাযোগে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা বুঝতে সাহায্য করে। এই ধারণাগুলি আজও স্যাটেলাইট যোগাযোগ, জিপিএস এবং মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

রেডিও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ

শিশিরকুমার মিত্র বেতার তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন, যা রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্যতম ভিত্তি। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বোঝা যায়, বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য কীভাবে রেডিও তরঙ্গের পরিসর ও গুণগতমানে প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান সময়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক, রেডিও সম্প্রচার এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT)-এর মতো প্রযুক্তিগুলির উন্নয়নে তার গবেষণার অনন্য অবদান রাখছে।

মহাকাশ বিজ্ঞান ও আবহাওয়া গবেষণায় অবদান ঃ

ড. মিত্রের গবেষণা মহাকাশ বিজ্ঞান এবং আবহাওয়া পূর্বাভাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়নোস্ফিয়ার এবং বায়ুমন্ডলের উপরের দিকের স্তর নিয়ে তাঁর কাজ স্পেস এক্সপ্লোরেশন, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ আবহাওয়া গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে অবদান ঃ

তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর গবেষণা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানকে একটি আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই অবদান ভারতীয় তরুণ গবেষকদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির পথিকৃৎ। তিনি স্কুল কলেজে বিজ্ঞান পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার নতুন জোয়ার আনেন। সেই জন্য ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। ■

গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান চর্চা ঃ

আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার

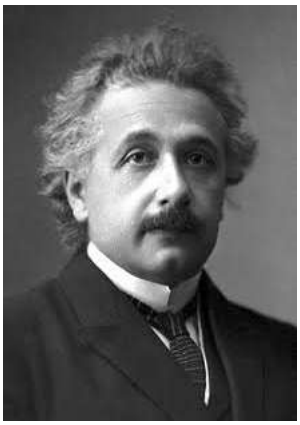

ভূমিকা ঃ বিগত ৪ঠা মে ২০২৪, ছাত্র-ছাত্রী ও উৎসাহীদের নিয়ে যে সেমিনার হয়েছিল বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনের বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটের উদ্যোগে, বিগত দুটি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে আলোচিত হয়েছে আইনস্টাইনের বিখ্যাত আবিষ্কার ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। দ্বিতীয় ও এখনো পর্যন্ত শেষে আলোচিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং মহাবিশ্বের নমনীয়তা। স্পেস এবং টাইমকে নিয়ে গড়া এই মহাবিশ্ব নমনীয়। বিগত সংখ্যার আলোচনার শেষে সঞ্চালক বলেছিলেন যে এই নমনীয় ইউনিভার্সের ধারণা মানুষের চিন্তা জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালো।

সঞ্চালক ঃ তোমরা হয়তো শুনে থাকবে আধুনিক পদার্থবিদ্যার প্রধান দুটি স্তম্ভ হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। এই যে ফোর ডায়মেনশনাল জিয়োমেট্রি (চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিক গঠন) বলতে গিয়ে উনি যে থিওরিটা এনেছেন, সেটা স্পেশাল থিওরি নয়, জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম মেকানিকস্ (কণাবাদী বলবিদ্যা) এই দুটো বিষয় আজকের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের স্তম্ভ।

এবার আমরা ঐ জায়গাটায় চলে আসি। আইনস্টাইন বললেন মহাবিশ্ব নমনীয়। তার সঙ্গে সঙ্গে লরেন্স বলেছিলেন, কী বলেছিলেন?

উত্তর ঃ টাইমটা বেড়ে গেলে স্পেসটা কমে যাচ্ছে (একমাত্রিক স্পেসে দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে)।

সঞ্চালক ঃ বস্তুর ভর, সেটাও বস্তুর গতিবেগের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে।

প্রথমে টাইমের বদলটা কেন হচ্ছে সেটা বলি। টাইমের চেঞ্জটা কেন হয়? মনে করো তুমি পৃথিবী পৃষ্ঠে রয়েছো। একটা স্পেস শিপকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণ করছো। স্পেস শিপের মাঝখানে থাকা কোনো ব্যক্তি দুটো টর্চ, দু'হাতে নিয়ে এর গতির অভিমুখে একটি টর্চ ধরলো, অন্যটি তার গতির বিপরীত অভিমুখে। দুটো টর্চ একই সঙ্গে জ্বালালো। ধরা যাক স্পেস শিপটা v গতিবেগে গতিশীল। আর আলোর গতিবেগ c। তা হলে স্পেস শিপে থাকা ব্যক্তি দেখবে তার হাতের দুটো টর্চ থেকেই c গতিবেগে আলো দু'দিকে নির্গত হল t সময় ধরে। কিন্তু তুমি কি দেখবে?

উত্তর ঃ যে টর্চটা থেকে আলো স্পেস শিপের বিপরীত অভিমুখে আছে, তার ক্ষেত্রে টর্চ থেকে নির্গত আলোর গতিবেগ $(c-v)$, অন্যটিতে আলোর গতিবেগ $(c+v)$।

কিন্তু শূন্যমাধ্যমে আলোর গতিবেগ স্থির, তা হল c এটাতো জানা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

সঞ্চালক ঃ তাহলে দুটো টর্চ থেকে নির্গত আলোর গতিবেগ কেন বলছো $(c-v)$ বা $(c+v)$?

– সকলে চুপ করে থাকে। উত্তর নেই। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর সঞ্চালক বলেন,

সঞ্চালক ঃ টাইম বলতে তোমরা কী বোঝো?

যদি সমবেগে কোনো বস্তু গতিশীল হয়, তখন টাইম (সময়) হল ডিসট্যান্স (আসলে ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ) বাই ভেলোসিটি (গতিবেগ)। যদি ধরে নাও লাইটের ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে তবে স্পেস শিপের বিপরীতে আলোর ভেলোসিটি $(c-v)$। স্পেস শিপের অভিমুখে আলোর ভেলোসিটি $(c+v)$। প্রথম ক্ষেত্রে দুটো টর্চ থেকে আলো সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছে ইতিমধ্যে বলেছি। তা হলে তোমরা জানো কোনো রকম ত্বরণ না থাকলে টাইম হল ডিসটেন্স বাই ভেলোসিটি। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে টাইমটা বেড়ে যাবে (স্পেস শিপের অভিমুখের বিপরীতে থাকা টর্চে), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টাইমটা কমে যাবে (দ্বিতীয় টর্চে)।

সঞ্চালক ঃ টাইম কমে গেলে ব্যাপারটা কী হবে?

উত্তর ঃ একদিকে টাইম ফাস্ট হয়ে গেল। অন্যদিকে গেল কমে।

সঞ্চালক ঃ যে দিকে টাইম কমে গেল, সেদিকে সে ফাস্ট (দ্রুত) অন্যদিকে স্লো (ধীর) হয়ে গেল। এই দুই দিকে কী পার্থক্য হল?

সবাই চুপ।

সঞ্চালক ঃ এই যে আমরা বললাম স্পেসের স্ট্রাকচার একই রকম নয়। তাহলে যদি বলি স্পেসটা সোজা আবার কোথাও যদি বলি স্পেসটা বেঁকে গেছে, সেরকম টাইমকে যদি এরকম সোজা না গিয়ে বেঁকে যেতে হয়, তাহলে ব্যাপারটা কী হবে?

তাকে বেশি পথ যেতে হবে।

স্পেস টাইমের ফোর ডি স্ট্রাকচারে (চতুর্মাত্রিক গঠনে) আলো যে পথগুলো পায়, আমরা বুঝি না, অথচ সে কিন্তু কতগুলো বেন্ডিং ওয়েড্ পাথ (বাঁকা পথ) পায়। কেন পাথ বেন্ডিং পায়? এই জন্য বলছি যে যেকোনো অবজেক্ট (বস্তু) থাকলে এই মহাবিশ্বের নমনীয় গঠনকে পাল্টে দেয়, তাকে আকা-বাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো করে দেয় এবং সেই পথেই আলো যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখবো কি লাইট স্ট্রেইট যাচ্ছে। আমরা সেটা কিন্তু ফলো করতে পারবো না। এইজন্য আমাদের প্রবলেম হয়ে যায়। আমরা মনে করি আলো সোজা যাচ্ছে বা তার কাছে ঐ পথটাই সোজা পথ। এভাবে টাইমের এক্সপানশান হয় অথবা ডায়লেশন হয়।

আমরা বলছি যে টাইমকে যদি সোজা পথে যেতে হয় বা বাঁকা পথে যেতে হয় একই বেগে, তাহলে বেশি পথ যেহেতু বাঁকা পথে যাচ্ছে, তাই এখানে টাইম বেশি লাগে। মানে টাইমটা কি হয়ে যাচ্ছে? প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলে টাইম ডায়লেশন। এটা কেন এমন হচ্ছে?

উত্তর ঃ মহাবিশ্বের স্টাকচারটার কারণে।

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, মহাবিশ্বের স্ট্রাকচারটাই এরকম। এইজন্য আইনস্টাইন বলেছেন যে এটা একটা জিয়োমেট্রিকাল স্ট্রাকচার, যেটা নমনীয়। কি রকম পরিবর্তন হয়? ধর, এই যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে, এর মধ্যে অন্যান্য কতগুলো প্ল্যানেট আছে। সূর্যের সবথেকে কাছাকাছি যে প্ল্যানেটগুলোর অরবিটের সঙ্গে দূরবর্তী প্ল্যানেটগুলোর অরবিটের কি ডিফারেন্স জানো?

সূর্যের কাছাকাছি প্ল্যানেটের অরবিট হয় ইলিপটিক্যাল, মানে উপবৃত্তাকার। যত দূরে যেতে থাকবে, তত অরবিটগুলো সারকুলার মানে বৃত্তাকার হতে থাকবে। **এটা কেন, তা আইনস্টাইনের আগে কেউ বলতে পারে নি।** নিউটনের বিজ্ঞান থেকে বলা যায়, যে কক্ষপথে ঘূর্ণনের বেগ বেশি (অপকেন্দ্র বল বেশি) সেই কক্ষপথ তত বড়। তোমরা জানো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনের শক্তি বেশি হয় তত, যত সে নিউক্লিয়াস থেকে দূরে ঘুরপাক খায়। প্ল্যানেট বা ইলেকট্রন যদি না ঘুরতো তবে তাকে বাইরে কেউ টেনে রাখতো না, সে ভিতরের দিকে চলে যেত। হাতের আঙুলের চারপাশে দড়িতে বাঁধা ঢিলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। নিউটনের আগে গ্যালিলিও মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে বলেছিলেন, বলো কী বলেছিলেন?

উত্তর ঃ সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে।

সঞ্চালক ঃ তার আগে আমাদের ধারণা কি ছিল?

উত্তর ঃ উল্টো।

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, একহাজার বছরের অধিক সময় ধরে ধারণা ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবী আছে স্থির। তার চারিদিকে সবাই ঘুরছে। এমনকী সূর্যও পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চাঁদও পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। অন্যান্য প্ল্যানেটরাও পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। সবাই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। আর পৃথিবী মহাবিশ্বের সেন্টারে, এই আইডিয়াটা ছিল। কিন্তু গ্যালিলিও সেই ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ সম্ভবত, দূরবীণ দিয়ে দেখলেন এক অদ্ভুদ জিনিস। সেটা কী? সেটা হল – বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলি তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আরো অনেক যুক্তি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, আসলে সূর্য রয়েছে কেন্দ্রে, এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার চারিদিকে ঘোরে। এই ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে কি সব শাস্তি পেতে হয়েছিল তোমরা জানো। নিউটন এসে মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে বললেন একটা বস্তু আরেকটা বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ করছে বলেই তো কাউকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে ঘুরতে পারছে। আবার যদি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার যদি কোনো গতিবেগ না থাকে, তাহলে সেতো এসে কেন্দ্রে পড়তো, সে ঘুরতে পারতো না। কিন্তু নিউটনের সময়ও মনে করা হত, বাইরে (সৌর জগতের বাইরে) যে তারাগুলো রয়েছে, সেগুলো মনে হয় একটা ফিক্সড স্ফিয়ারের মধ্যে রয়েছে এবং ঐখানে রয়েছে স্বর্গ। একদম নিউটনের সময় এই আইডিয়াটা ছিল। কিন্তু দেখ নিউটনের সময় এই আইডিয়াটা থাকলেও নিউটনও এরকম একটা স্বর্গ আছে, এরকম বিশ্বাস করতেন না, তা নয়। তিনি যা ভাবেন ভাবুন, কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত সূত্র কী বলছে? বলছে এই আকর্ষণ বলের অস্তিত্ব থাকলে স্পেসে কোনো অবজেক্ট স্থির থাকতে পারবে না।

এখান থেকে তার সূত্র স্থির মহাবিশ্বের ধারণাকে ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু সময় সম্পর্কে 'সময় শাশ্বত-অনন্ত' এই নিয়মকে ভাঙা যায় নি। **এই নিয়মকে ভেঙে দিলেন আইনস্টাইন, তাঁর স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে। টাইম সম্পর্কে পুরানো ধারণাটা ভেঙে গেল আইনস্টাইনের ধারণায়। তিনি বললেন টাইম হল মহাবিশ্বের স্ট্রাকচারেরই একটা পার্ট। এটা ছাড়া মহাবিশ্বকে এভাবে ভাবা যায় না।** তাহলে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন না? কিন্তু একটা প্রশ্ন কেন কোরবো না, এই যে টাইমের এক্সপানশান হয়, সবার কাছে টাইম এক নয়, কারো

কাছে টাইম ধীরে চলে, কারো কাছে দ্রুত চলে, এটা কি মানতে পারো? ব্ল্যাকহোল নিয়ে আলোচনার সময় বলেছিলাম যে, যত তুমি ব্ল্যাকহোলের কাছে যাবে, টাইমটা তোমার তত ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যাবে এবং স্লো হতে হতে ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে টাইম থেমে যাবে, বলা হয়েছিল? তাহলে টাইম কী? ধর ব্ল্যাকহোলের দিকে যে যাচ্ছে যে স্পেস শিপে করে, সেই স্পেস শিপে যদি থাকো, তা হলে কী হবে?

উত্তর ঃ সময় আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাবে।

সঞ্চালক ঃ ইন্টারস্টেলার বলে একটা মুভি আছে, দেখেছো কেউ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

সঞ্চালক ঃ সেই মুভিটা কি দেখাচ্ছে? দেখাচ্ছে এক ব্যক্তি তাঁর মেয়েকে পৃথিবীতে রেখে নতুন একটা গ্রহে গেছে। যে গ্রহে গেছে সেই গ্রহের একঘন্টা সমান পৃথিবীর সাত বছর। ঐ গ্রহে তিনি কতক্ষণ ছিলেন? তিন ঘন্টা ছিলেন। তাহলে তিন ঘন্টায় পৃথিবীর একুশ বছর পার হয়েছে। তিন ঘন্টা পরে তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন, তখন তাঁর কত বয়স বাড়লো?

উত্তর ঃ তিন ঘন্টা।

সঞ্চালক ঃ তিন ঘন্টা বয়স বাড়লো। মেয়ের বয়স কত বাড়লো।

উত্তর ঃ একুশ বছর।

সঞ্চালক ঃ একুশ বছর বেড়ে গেল।

উত্তর ঃ এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে, আমি তো তিন ঘন্টা দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলো কি তিন ঘন্টা অ্যানালিসিস করছে?

সঞ্চালক ঃ এই সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারবে?

ও বলছে যে আমাদের হৃৎপিন্ড, আমাদের চোখ, আমাদের ব্রেন, সমস্ত যে অরগানগুলো, সে তাকে তিন ঘন্টা হিসাবে কিভাবে দেখছে, তাই তো প্রশ্নটা?

উত্তর ঃ তার বয়সের পরিবর্তন হচ্ছে না, তাই তো?

সিনেমায় দেখিয়েছে তার চুল পাকেনি বা অন্য কোনো বয়স বাড়ে নি।

সঞ্চালক ঃ সিনেমায় যা দেখিয়েছে, ঠিকই দেখিয়েছে। থিওরিটিকালি এটাই ঠিক।

উত্তর ঃ থিওরিটিকালি, কিন্তু

সঞ্চালক ঃ টাইম ডায়লেশনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত কিছু স্লো হয়ে যাচ্ছে, তোমার চিন্তাভাবনা স্লো হয়ে যাচ্ছে, তোমার হৃৎপিন্ডের গতিপ্রবাহ, সেটাও স্লো হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছু যদি স্লো হয়ে যায়, আসলে তুমি সেটা ফিল করতে পারবে না। তুমি সেটা অ্যাডভান্টেজ মনে করবে না। তোমার এই তিন ঘন্টার এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাবে না। তুমি তিন ঘন্টাকেই এনজয় করবে। পৃথিবীতে যে ছিল সে একুশ বছরকে এনজয় করেছে, তুমি তা থেকে বঞ্চিত হবে। তুমি শারীরিকভাবে ইয়ং থেকেছো। ইয়ং থেকে তোমার কি লাভ হয়েছে? তুমি মাত্র তিনঘন্টা পাস করে ইয়ং থেকেছো। আর সে তো একুশ বছর কাটিয়েছে। বায়োলজিক্যাল ক্লক ঐভাবে অ্যাডজাস্ট হবে।

উত্তর ঃ এমনকি চিন্তাও।

সঞ্চালক ঃ চিন্তা, ব্রেনের নিউরাল নেটওয়ার্ক তিনঘন্টাই ভাবছে। পৃথিবীতে থাকলে তিন ঘন্টায় যেমন ভাবতে, স্পেসে বসে তাই ভাবছো।

আর একটা জিনিস, স্পেস শিপটা যখন খুব ফাস্ট যাচ্ছে, যদি খুব হাই স্পিডে যায়, তখনো কিন্তু কি হয়, টাইম ডায়লেশন হয়। টাইমটা খুব স্লো হয়ে যায়। দুটো কারণে হয়। একটা হচ্ছে তুমি কোথায় যাচ্ছো। সেই জায়গার স্পেস-টাইম কার্ভেচার কিরকম। স্পেস-টাইম কার্ভেচার কোথায় কোন্ অবজেক্ট আছে, তার উপর ডিপেন্ড করে সে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মানে মাসের (ভরের) উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা জিনিসের উপরও স্পেস-টাইম কার্ভেচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই যে তুমি স্পিডে গেলে সেখানে স্পেস টাইম কার্ভেচার তৈরি হয়। তোমরা দেখবে হাইস্পিড গেম যারা খেলে, তোমরা দেখবে গাড়িটা যখন খুব স্পিডে যায়, তখন দেখ না, স্ট্রেইট রোডটা একটা সুরঙ্গের মতো হয়ে গেছে। উপর থেকে বেঁকে আসছে, দেখায় না। আসলে ঐ কনসেপ্ট থেকেই নিয়েছে। যখন স্পিড খুব বেশি হয়ে যাবে, তখন স্পেস টাইমের কার্ভেচার তৈরি হবে। তার ফলেই টাইমটা স্লো হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে যাবে।

সৌর জগতে সেন্টারের কাছাকাছি পাথগুলো অনেকটাই ইলিপটিকাল, দূরেরগুলো ক্রমশ সার্কুলার, তার কারণ হল, এখানে যেহেতু সূর্য রয়েছে, সেই কারণে তার ভরের জন্য স্পেস টাইম কার্ভেচার হয় অনেক বেশি। আর বেশি স্পেস টাইম কার্ভেচারে যখন কোনো বডি মুভ করে তখন সে ইলিপটিকাল শেপ নিতে পারে। আর যত দূরে হবে স্পেস টাইম কার্ভেচার তত ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। সেই জন্য সে তার পাথটা অপেক্ষাকৃত সার্কুলার করবে।

এখান থেকে আরেকটা জিনিস বলার দরকার ভরের পরিবর্তন। কোনো বস্তু কি কখনো আলোর মত বেগ পেতে পারে?

উত্তর ঃ না।

সঞ্চালক ঃ কেন?

আলোর বেগে চললে $m=\frac{mo}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ সূত্রানুযায়ী বস্তুর বেগ v, এবং স্থির অবস্থায় ভর mo হলে গতিশীল অবস্থায় যখন $v=c$, অর্থাৎ আলোর বেগ হবে তখন পরিবর্তিতা ভর $m=\frac{mo}{o}$ অর্থাৎ অসীম পরিমাণ, সে ক্ষেত্রে এই ভর থেকে শক্তির রূপান্তরে $E=\frac{m_o{}^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ এ শক্তির পরিমাণও হবে $E=\frac{m_o{}^2}{0}$ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট পরিমাণ, যা কখনো সম্ভব নয়। এই জন্য একটা ইলেকট্রনকে যদি আলোর গতিবেগ দাও, তাহলে যতটা শক্তি তাকে দিতে হয়, সেই শক্তি সারা মহাবিশ্বে নেই। মহাবিশ্বের ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র অমান্য হয়ে যায়।

উপস্থিত এক দর্শকের প্রশ্ন ঃ ফোটন কণার এনার্জি তা হলে কত হবে?

সঞ্চালক ঃ এটা আজকের সেরা প্রশ্ন।

ফোটন কণার এনার্জি কি? এটাকে একটা কণা বললেও এটা $h\nu$ নিয়ে তৈরি হয়েছে। এখানে $h=$ প্লাঙ্ক ধ্রুবক, $\nu=$ আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। এর কোনো মাস (ভর) নেই। দু'রকম পার্টিক্‌ল আছে। এক ধরনের পার্টিকেলকে বলে মাস পার্টিকেল, অন্য ধরনের পার্টিকেল হল এনার্জি পার্টিকেল, এর কোনো মাস থাকে না। ফোটন এনার্জি পার্টিকেল হওয়ায়, ফোটনের মাস নেই।

সঞ্চালক ঃ মাসটা চেঞ্জ হয় আমরা দেখছি আগের মতো পার্টিকেলটা ভেলোসিটিতে থাকে। যত ভেলোসিটি বাড়বে এক্সট্রা একটা এনার্জি গ্যাদার করবে। তার মানে কোনো বস্তু যখন চলে তখন একটা বল তৈরি হয়, সে বস্তুটাকে চাপ দেয়, ঐ চাপটাই আসলে গতিবেগ, তাকে কিছুটা কমিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অথবা তুমি বলতে পারো এটা কি করে মাসটাকে (ভরকে) বাড়িয়ে দেয়। ভরকে কি বলা হয়, জাড্যতা?

এই জাড্যতার পরিমাপ কী?

উত্তর ঃ জাড্যতা মানে জড়তা, বস্তুটা স্থির থাকবে, না গতিশীল থাকবে, তার পরিমাপ।

সঞ্চালক ঃ হ্যাঁ, তা, এই জাড্যতার পরিমাপটা কী?

উত্তর ঃ তার ভর

সঞ্চালক ঃ ঐ যে বস্তুটা চলছে, সেটা চলার সাথে সাথে কী হবে? একটা ফোর্স তৈরি হবে। সেই ফোর্স (বল) টা ওকে চাপ দেবে। ওটাকে সংকুচিত করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার সাথে সাথে তার ভরটাও বেড়ে যাবে। আসলে এই বাধাটাই তো ভর। এখান থেকে আইনস্টাইন দারুণ একটা জিনিস ভেবেছেন। যদি এই ঘটনা ঘটে তবে যে পরিমাণ শক্তি বাড়ছে। ঐ শক্তিই হতে পারে অতিরিক্ত মাসের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত (সমানুপাতিক সম্পর্ক)। এই শক্তিকে c^2 দিয়ে ভাগ করলে পাবো এই মাস বা মাস ডিফেক্ট যাই বলো। এখানে এক্সট্রা যে মাসটা সে গেইন করছে অবজেক্টটা চলার সময়, (গতিশক্তি বেড়ে গেছে বলে, বেগ বাড়ার কারণে এই গতিশক্তির বৃদ্ধি হয়েছে) তার জন্য আমরা বললাম এক্সট্রা মাস ও বাড়বে, সেই যে এক্সট্রা মাস কী রকম রেটে বাড়বে?

E/c^2 রেটে $[E=$ গতিবেগ বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত শক্তি $]$

এখান থেকে পাচ্ছো $E=\partial M.c^2$ $[\partial M=$ মাস ডিফেক্ট $]$

আমরা যখন দৌড়াই, তখনও এই ঘটনা ঘটে, তবে তার পরিমাণ এতটাই কম (আমাদের কম গতিবেগের কারণে) যে বোঝাই যায় না। তবে বাস্তবে এভাবে গতিশীল বস্তুর 'ভর-শক্তি'-র রূপান্তর হয়েই চলেছে।

সঞ্চালক ঃ ঠিক আছে আমরা এখানে শেষ করবো। যে বিষয়টা বলার যে আইনস্টাইন যে কারণে বিখ্যাত, সেটা হচ্ছে তার আপেক্ষিকতাবাদ। তার মধ্যে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে কিছুটা আলোচনা হল। এখানে যে তিনটে জিনিসের পরিবর্তন তিনি দেখালেন, সেগুলো লরেন্স ট্রান্সফরমেশন থেকেই নেওয়া। এই তিনটে জিনিস – লেন্থ, টাইম এবং মাস। এই মাসের থেকে তিনি একটা কনক্লুশনে পৌঁছান, তাহল mc^2 এর ভরকে শক্তিতে রূপান্তর ঘটালে যে বিপুল শক্তিকে ইলেকট্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করলে, তাকে জনস্বার্থে ব্যবহার করা যায়। আবার একে আণবিক বোমা তৈরি করতেও কাজে লাগানো হয়েছে।

তবে আইনস্টাইন কিন্তু এ জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি, তিনি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। নিজের বদ্ধমূল ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে জীবনে যা অদ্ভুত লাগে তার কারণ সন্ধান করেছেন। তিনি মহাবিশ্বের যে চারটি বল আছে, তাকে এক করার জন্য জীবনের শেষ তিরিশ বছর কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনের এই শিক্ষা আজো পাথেয়। ■

বিশেষ রচনা ঃ

অভয়ার ভয় নাই – রাজপথ ছাড়ি নাই!

২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন যে অভিজ্ঞতা ও ধারণা দিয়েছে তার সম্পর্কে আলোচনার বোধ হয় এখন সময় হয়েছে। কারণ যখন এই আন্দোলন সর্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছিল, সে সময় অনেকেই মনে করেছিলেন এই আন্দোলন কতদিন টিকবে সন্দেহ আছে? বিচার আমরা কার কাছে চাইছি? ঠিক আছে আন্দোলন চলছে ভালোভাবেই, কিন্তু যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, তারা প্রবল পরাক্রমশালী। এদের বিরুদ্ধে লড়ে ন্যায় বিচার কি পাওয়া সম্ভব?

প্রবল পরাক্রমশালী শাসকশ্রেণীর শোষণ-নিপীড়ন আমরা দীর্ঘকাল ধরে সয়ে আসছি। সমাজে নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নারীসমাজ পুরুষতন্ত্রের সংস্কৃতির শিকার হয় শৈশব থেকেই অনেক সময় মায়ের গর্ভে ভ্রূণাবস্থায়। কিন্তু মানা আর না মানার দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রধানত আপোষের রাস্তায় চলতে হয় তাঁদের। তবু তাঁদের একাংশ মনে করেন কর্মক্ষেত্র সেকেন্ড হোম। এখানে আমরা নিরাপদ। কয়লাখনির শ্রমিক কিংবা ইঁটভাটায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকরা কখনো এমন মনে করেন না। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন তারা মেনে নিতে বাধ্য হলেও বিরুদ্ধতা তাদের নেই কে বলবে? নারী নির্যাতনকে আমরা কি শুধু নারীর উপর নির্যাতনরূপে দেখবো? কখনোই নয়। যে পরিবারে মা-বোন-দিদি-স্ত্রী'র উপর এগুলো ঘটে, সেখানে তার সন্তান-ভাই কিংবা পুরুষ জীবনসঙ্গীও ওতপ্রোত জড়িত থাকেন। শাসকশ্রেণীর শ্রেণী শোষন বজায় রাখতে যে দমন-পীড়ন চলে, নারীসমাজের উপর তা সব থেকে আগে নেমে আসে। তার কারণ নারীরা 'সফট টার্গেট'। অনেকে হয়তো এমন উদাহরণ দেবেন যেখানে পুরুষতন্ত্র কায়েম হচ্ছে নারী প্রতিনিধির দ্বারাই। কিন্তু সেটা সংখ্যায় অল্প এবং যে বা যারা তা করে, তারা পুরুষতন্ত্রের স্বার্থেই তা করে। পুরুষতন্ত্র একটা ব্যবস্থা যা টিঁকিয়ে রেখেছে শাসকশ্রেণী, সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হওয়ার সময় থেকে। কিন্তু ঘাড়ের উপর চাপানো এই জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য যে চেতনার প্রয়োজন, যতদিন নারীসমাজ নিজের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন তার এই চেনতার উন্মেষ হয় নি। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ তাকে উৎপাদনের প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে, তাকে শিক্ষার অঙ্গনে সামিল করেছে। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মত পুঁজিবাদও নারীদের সমানাধিকার তো দূরের কথা ভোটাধিকারও দেয়নি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সে দেশে নারীদের পুরুষের সমানাধিকার প্রাপ্তির পর ইউরোপ-আমেরিকাসহ দেশে দেশে নারীমুক্তি আন্দোলন তীব্র হয়। আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে মহিলাদের প্রথম ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার দিয়েছে, তার রাষ্ট্রযন্ত্রে অঙ্গীভূত করেছে। এই প্রয়াস নারীসমাজকে সচেতন করেছে। সে মুক্তি চাইছে পুরুষতন্ত্রের জোয়াল থেকে। এই আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ অপেক্ষাকৃত সুযোগ-সুবিধা যারা পাচ্ছেন তাদের মধ্যে দেখা গেলেও সমগ্র সমাজে এই চাহিদা এখনও রয়েছে সুপ্তরূপে।

যে জুনিয়র ডাক্তারা বর্তমান গণআন্দোলনের রূপকার তারাও আকাশ থেকে পড়ে নি। এই সমাজ থেকেই উঠে এসেছেন। তাই জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে তাদের পেশাগত নিরাপত্তার দাবির ভিত্তিতে যেমন দেখতে হবে, একই সঙ্গে তাকে দেখতে হবে জনতার অংশ হিসেবেও।

জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া আন্দোলনে জনতার অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়ভাবে দেখা গেছিল ১৪ই অগাস্ট ২০২৪ মধ্যরাতে। কিন্তু প্রদীপ জ্বলার আগে যেমন সলতে পাকানোর প্রয়োজন হয়, তেমনি এই অনির্বাপিত ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠার আগের পরিস্থিতিটা অবশ্যই বিচার করা দকরার। জুনিয়র ডাক্তাররা, সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক আগে থেকেই তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। তারা জানতেন অর্থের বিনিময়ে ডাক্তারি ছাত্রদের পরীক্ষায় ফেল করানো হয়। কথা না শুনলে রেজিস্ট্রেশন পেতে সমস্যা হয়, মহিলা শিক্ষাত্রীদের শুধু টাকার হুমকি নয়, অতিরিক্ত নিপীড়ন মুখবুজে মেনে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। শুধু কি ডাক্তারি শিক্ষাত্রীরা? স্বাস্থ্য কর্মীরা পর্যন্ত জানতেন এখানে বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ে, মৃতদেহ নিয়ে দুষ্টচক্র (নেক্সাস) চলে। আর জি করের তৎকালীন ডেপুটি সুপার আখতার আলী কিংবা ডোম মনোজ মল্লিক লিখিতভাবে অভিযোগ অনেক আগেই জানিয়ে এসেছেন। ছাত্ররা অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অনশন, ধর্ণা-প্রতিবাদ করেছেন অনেকবার (তার সাক্ষ্য বহন করছে ভাইরাল হওয়া ফুটেজগুলো)। পূর্বতন অধ্যক্ষের (সন্দীপ ঘোষ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল বলেই তাকে জেলা হাসপাতালে নিম্নপদে শাস্তিমূলক বদলি হতে হয়েছিল। বিক্ষোভ ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগপত্র জমা পড়েছিল

স্বাস্থ্যভবনে। কিন্তু একজন আর জি করে কর্তব্যরত ডাক্তার তাপস প্রামাণিকের কথার থেকে ধার করে বলা যায় 'স্বাস্থ্যভবন আর প্রাক্তন অধ্যক্ষ সমার্থক' – একথা সঠিক প্রমাণিত হয় যখন অভিযোগপত্রগুলো তদন্তকারী সিবিআই খুঁজে পায় অভিযুক্তের বাসভবনে। আর নিম্নপদে বদলি হওয়ার সাত দিনের মধ্যেই রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের নির্দেশে ফিরে আসেন কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে পুনরায় অধ্যক্ষপদে। এত অপরাধের পরেও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ফের পদে রেখে দেওয়ার জন্য সওয়াল করেন প্রকাশ্যে।

আর জি করের জুনিয়র ডাক্তাররা দেখেছেন ৯ই অগাস্ট, ২০২৪ সকাল থেকেই হত্যাকান্ডকে আত্মহত্যা বলে চালানো হচ্ছিল, মৃত সহকর্মীর ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছিল না তার বাবা-মা'কে। সে সময় সিনিয়র ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম পাশে এসে দাঁড়ায়।

ডাক্তারদেরই একটা সংগঠিত শক্তি যখন পাশে দাঁড়ায়, প্রথমে আর জি কর, তারপর সমস্ত মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা একত্রিত হতে থাকেন। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে পোস্টমর্টেম করতে। এদিকে যে প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটলো তারা পুলিশে এফআইআর করার সময় সারা দিনে পেলেন না। অথচ সকাল থেকেই অচেনা অজানা লোকজন (নর্থ বেঙ্গল লবির লোকজন বলে পরিচিত) ক্রাইম সিনে হাজির হল। বোঝা যাচ্ছিল খুন-ধর্ষণের প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চলছে। এমন অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে পোস্টমর্টেমে রাজি হল কর্তৃপক্ষ। জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর বিধি মেনে জুনিয়র ডাক্তারদের সম্মতিসূচক সাক্ষর করতে হোত। জুনিয়র ডাক্তাররা তাই করলেন। শাসক পক্ষ তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সিসি ক্যামেরা থেকে প্রমাণ লোপাট করেছে, মৃতার মোবাইল থেকে মেসেজ মুছে দিয়েছে, তার দেহের উপরে থাকা কাপড় তিনবার পাল্টেছে। আর কি কি করেছে সেসব অজানা। এমনকি হত্যাকান্ডের স্থল অর্থাৎ ক্রাইম সিনটা অলটার (বদল) হয়েছে বলে সন্দেহ আছে। শীর্ষ আদালতকে সিবিআই সিসি ক্যামেরা ও মৃতার মোবাইল থেকে যে তথ্য মোছা হয়েছে, সংবাদপত্রে তা প্রকাশ হয়েছে।

বিধি ভেঙ্গে সূর্যাস্তের পর ময়না তদন্ত করেছে। ময়নাতদন্তের পর তাড়াহুড়ো করে বাড়ির লোককে তোয়াক্কা না করে দাহকার্য শেষ করেছে প্রমাণ লোপাট করতে। তারা মৃতার বাড়ি গিয়ে টাকার বান্ডিল দিয়ে তাদের চুপ করানোর চেষ্টা করেছে। তৎকালীন সিপি সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন যে সমস্ত প্রক্রিয়াটি হয়েছে তার নেতৃত্বে। নির্মম এই হত্যাকান্ডের পরদিন অর্থাৎ ১০ই অগাস্ট, জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতিতে চলে যান, যা সম্পূর্ণ কর্মবিরতিতে পরিণত হয় ১১ই অগাস্ট থেকে। গড়ে ওঠে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ল ডক্টরস্ ফ্রন্ট (WBJDF)

১০ই অগাস্ট কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রাই নামক এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে জানিয়ে দেয় অপরাধী ধরা পড়েছে। মজার ঘটনা হল অভিযুক্ত ধরা পড়ার পর নির্দ্বিধায় জানায় সে ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি। বোঝা যায় বিগত সমস্ত ক্রাইমে যেমন পুলিশ ভাড়াটে অভিযুক্ত জোগাড় করে কেস ফাইল করে, আবার বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় তারা ছাড়াও পেয়ে যায়। তেমনি ভাড়াটে অভিযুক্ত হল এই সঞ্জয়। সে অপরাধে জড়িত হোক বা না হোক, সম্ভবত সময় মত ছাড়া পেয়ে যাবে এই আশ্বাস পেয়ে সে অবলীয়ায় ধরা দিয়েছিল। এই সঞ্জয় রাইকে পুলিশ গ্রেফতার করে পুলিশেরই ব্যারাক থেকে। সে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াতো হাসপাতালে। অর্থাৎ সে ঐ হাসপাতালে নিয়মিত যেত। এমন বহিরাগতর হাসপাতালে প্রবেশ-প্রস্থানে কোনো বাধা ছিল না। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজ্য সরকার স্ব-ইচ্ছায় তদন্তের ভার সিবিআই'কে দিতে চাইলো। বিশ্লেষকরা বললেন যে রাজ্য সরকার তার ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার এবং তদন্তের ভার সিবিআই'কে দিয়েছিল। কিন্তু এটা করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা থেকে, মৃতার মোবাইল থেকে তথ্য লোপাট করে, ক্রামই সিন (সম্ভবত) পাল্টে এবং হত্যাকান্ডের পরদিনই সংলগ্ন বাথরুমের দেওয়াল ভেঙে প্রমাণ লোপাট করার পর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন এই পরিস্থিতিতে তদন্তের ভার নিল, তেমনি শীর্ষ আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্তের তদারকীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। জনতা বুঝতে পারলো সম্ভবত কেন্দ্র-রাজ্য সেটিং হয়ে গেছে। কারণ তদন্তকারীরা যাই আবিষ্কার করুক শাসকশ্রেণীর স্বার্থে তা হানিকর হলে কখনোই প্রকাশ্যে আসবে না। এ ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থার যোগ্যতা বিচারের বিষয় নয়।

এমনই এক সন্দেহের বাতাবরণে ১২ই অগাস্ট বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নাগরিক সংগঠন কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আর জি কর পর্যন্ত মিছিল করলো। অন্যদিকে মেডিকেল কলেজগুলিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান চলছিলই।

একদিকে অসুরক্ষিত ডাক্তারি সমাজ নিরাপত্তাহীন হয়ে নিরাপত্তা চাইছিলেন, অন্যদিকে জনতা পাবলিক প্লেসে প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার প্রতিবাদ করছিল। একজন জুনিয়র ডাক্তার বলেছিলেন – **'ভয় যেমন সংক্রামক, সাহসও তেমনি সংক্রামক।'** জনগণ অপেক্ষায় ছিল প্রতিবাদ করার জন্য সংগঠিত শক্তির। ১৪ই অগাস্ট সামাজিক ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং তার সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে সারা রাত একটি নারীবাদী সংগঠনের ডাকে

রাত দখলের ডাক দিল। তারা শুরুতে কেবলমাত্র কলকাতার মাত্র তিনটি স্পটে শুধুমাত্র মেয়েদের ডেকেছিল। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহার কাছে পুরুষরা জানতে চায় কেন শুধুমাত্র মেয়েরা, পুরুষরা নয় কেন? পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়। প্রথম নাগরিক কনভেনশনে (জুনিয়র ডাক্তারদের) তাদের প্রতিনিধি বলেছিলেন যে তারা মাত্র তিনটি স্পট নির্ধারণ করেছিলেন, বাস্তবে পাঁচশের অধিক স্পটে জনতা সামিল হয়ে স্লোগান তোলেন – **'প্রীতিলতার এই মাটিতে ধর্ষকদের ঠাঁই নাই',** তারা আওয়াজ তোলেন – **'গুঁড়িয়ে দাও পিতৃতন্ত্র। কেঁপে উঠুক রাষ্ট্রযন্ত্র'।**

জনগণ চাইছিলেন তার প্রতিবাদ জানাতে এমন এক আধার, যেটা কিনা এতদিনকার কলুষতাপূর্ণ, স্বার্থান্বেষী রাজনীতি করা শাসকশ্রেণীর দলগুলির স্বার্থে কাজ করা কোনো মঞ্চ নয়। এখানে কেউ গাড়ি ভাড়া করে মহানগর পরিদর্শন ও বিরিয়ানির প্যাকেটের লোভ দেখিয়ে লোক জমায়েত করেনি। সবাই মফস্বল থেকে শেষ রাতের ট্রেন ধরে, গাড়ি ভাড়া করে, স্কুটার, সাইকেলে, হেঁটে মধ্যরাতে জড়ো হলেন। কারা এলেন? শুধুমাত্র অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা নয়, দলে দলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সব সংস্কার ভেঙে প্লাবনের মতো জড়ো হলেন, প্রতিবাদ করলেন।

শাসকশ্রেণী সেদিন হতবাক হয়ে গেছিল। তাদের কোনো কৌশল এর প্রতিরোধে সেদিন কাজে আসে নি। অন্যদিকে অবিচার, অনাচার, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তুষের মত ক্ষোভের আগুন পরিমাণের গুণগত রূপান্তর ঘটিয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ডাক্তারি সমাজ, স্বাস্থ্যকর্মী সহ জনগণের মধ্যবিত্ত অংশের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটাই এক সুরে আন্দোলনে নেমে পড়লো। যতই জনতার অংশগ্রহণ বাড়তে লাগলো, ততই জুনিয়র ডাক্তারদের নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন জোরদার হতে লাগলো। জনগণের দাবিগুলি আন্দোলনে হাজির হতে লাগলো। কিন্তু ডাক্তারদের এই আন্দোলন যেমন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিল, (এর পিছনে ৮৩'র জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের মতো জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি ছিল না) তেমনি জনতার আন্দোলনে সামিল হওয়াটাও ছিল কার্যত ১৪ই অগাস্টের 'রাত দখলের অভিযান'-এর ফলশ্রুতি। জনতা ভয়হীনভাবে তার ভাব সংক্রামিত করেছিল। সমাজ বিজ্ঞান অনুসারে পরিমাণ গুণের জন্ম দেয়। যতদিন জনতা দলে দলে সামিল হন নি, ততদিন তাদের চেতনার এই উন্মেষ হয় নি। প্রতিদিনের প্রায় প্রতিটা খবর এই সময় মানুষ খুঁটিয়ে পড়েছেন বা সোসাল মিডিয়ায় ফলো করেছেন। সেই খবর আবার ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে। পথে নামাটা মধ্যবিত্তের 'ঘৃণ্য বর্জনীয় কালচার' আর থাকলো না। কে কবে মিছিল সংগঠিত করছে, কোথায় জনসভা হবে, সেখানে উপস্থিত থাকাটা নিত্যদিনের কাজের মতো হয়ে গেল। এভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে গেলে শাসকরা চাপে থাকবে, তারা সেটিং করে একজোট (অর্থাৎ শাসকশ্রেণী) তো, আমরাও একত্রিত হয়ে রাজপথ দখল করবো। স্লোগান উঠল – **'অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই।'** পথে নামা স্লোগান দাতারা কেউ মনে করেনি যে এই অভয়া শুধুমাত্র আর জি করের ডাক্তার বোনটি, তা সম্পূর্ণ নির্যাতিত নারীসমাজ। জনতা মনে করেছে তাদের প্রাচীরের মতো ঘিরে ধরবো আমরা। আন্দোলনের প্লাবন শুধুমাত্র আর জি কর হাসপাতাল বা শহর কলকাতা বা মফস্বল নয় রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে এমনকি বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশের মাটিতে। শহরের রাজপথ থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের মেঠো পথও **জাস্টিস ফর আর জি কর** স্লোগানে মুখরিত হলো।

আমরা অন্যদিকে দেখেছি ১৩ই অগাস্ট আর জি করের প্রিন্সিপালের প্রাইজ পোস্টিং হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। ১৪ই অগাস্ট রাতে আর জি কর হাসপাতাল ভাঙচুড় হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে এবং ক্রাইম সিনে ভাঙচুড় করার চেষ্টা হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তাররা সন্দীপ ঘোষকে ঢুকতে দেয়নি হাসপাতালে, কিন্তু রুখতে পারে নি আর জি করের ভ্যানডালিজমকে।

মরিয়া হয়ে প্রশাসন আক্রমণ নামিয়ে প্রমাণ লোপাট করতে চাইলেও আন্দোলনরত ডাক্তাররা আরো সংগঠিত হয়ে যায়। জনতার প্রশাসনের প্রতি মোহের আবরণ সরে গেল। ১৫ই অগাস্ট WBJDF প্রথম প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যজুড়ে এমনকী অন্য রাজ্যেও কিছু ক্ষেত্রে কর্মবিরতি শুরু হল। ১৮ই অগাস্ট ডার্বি ফুটবল ম্যাচ বাতিল হল, কারণ সেদিন দর্শকরা প্রাদেশিকতা ত্যাগ করে মাঠে দাঁড়িয়ে অভয়ার ন্যায় বিচার চেয়ে আন্দোলনে নামবে ঠিক করে। আবার প্রশাসন ভুল করলো। ডার্বি ম্যাচ বাতিল করল। খেলার মাঠে স্লোগান উঠলো – 'বাতিল করবি ডার্বি / ২৬শে হারবি।' সংবাদপত্রে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পড়া সমর্থককে দেখা গেল মোহনবাগানের সমর্থকের কাঁধে চেপে প্রতিবাদ করতে। স্লোগান উঠল – **'এক হয়েছে বাঙাল ঘটি / ভয় পেয়েছে হাওয়াই চটি'**। এমনকী মহামেডান স্পোটিংকেও দেখা গেল এই প্রতিবাদে সামিল হতে। স্লোগান উঠলো – **'তিন প্রধানের এক স্বর / জাস্টিস ফর আর জি কর।' 'আর্জি নয়, দাবি কর / জাস্টিস ফর আর জি কর'**। ১৯শে অগাস্ট রাখীবন্ধনের মাধ্যমে প্রাদেশিকতা-ধর্মীয় ভেদাভেদ মিটিয়ে নিল জনগণ। এমনকী দলীয় সমর্থন জনিত ভেদাভেদও তারা রাখলো না।

ইতিমধ্যে বিরোধী হিন্দুত্ববাদী দল পরিস্থিতির সুযোগ নিতে 'মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' চেয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় ২৭শে অগাস্ট। ৫০০০ জুনিয়র ডাক্তার সহ জনগণ (সারা রাজ্যে ৭৫০০ জনের মতো জুনিয়র ডাক্তার আছেন) করুণাময়ী থেকে স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেন ২১শে অগাস্ট।

২৬শে অগাস্ট তারা সকল জনতার উদ্দেশ্যে গণকনভেনশনের ডাক দেন। সেখানে সিনিয়র ডাক্তার অর্নব সেনগুপ্ত বলেন – "এই আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখে ন্যায় বিচার ছিনিয়ে আনতে গেলে জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তারদের উচিৎ আন্দোলনকারী সাধারণ জনতার সাথে একাত্ম হওয়া। আমরা সিনিয়র ডাক্তাররা শেষ দিন অবধি জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকব, কিন্তু তাতেই কাজ হবে না। আন্দোলনকারী জনতাকে নিয়ে অবিলম্বে একটি মঞ্চ গড়া দরকার। সেই স্থায়ী মঞ্চে আলাপ আলোচনা করে কর্মসূচী ঠিক হবে এবং এই আন্দোলন ডাক্তার সমাজ এবং প্রতিবাদী জনতার যৌথ উদ্যোগে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে।" ঐ দিনের সভায় সিনিয়র ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মের তরফে ডঃ পূণ্যব্রত গুণ জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে নিঃশর্ত সমর্থন শেষ পর্যন্ত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া দলীয় রাজনীতির ছাতার তলায় নয়, স্বাধীন গণআন্দোলনের ডাক ওঠে। হাসপাতালে সিন্ডিকেট রাজের বিরোধিতা উঠে আসে। ধর্মীয় বিভেদকামীদের কায়েমী স্বার্থে আন্দোলন যাতে পরিচালিত না হয়, তার জন্য হুঁশিয়ারী শোনা যায়। পরদিনই ছিল হিন্দুত্ববাদীদের ডাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে নবান্ন অভিযান। জুনিয়র ডাক্তাররা এই দিন স্পষ্ট করে দেন যে কোনো রকম সংসদীয় ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে তারা পা দেবেন না।

জুনিয়র-সিনিয়র সহ জনতার ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে জুনিয়র ডাক্তাররা অরাজনৈতিক নাগরিক আন্দোলন বলে এসেছেন। আন্দোলনকারী জনতারও তাতে সায় ছিল। কারণ সংসদীয় দলগুলির প্রতি জনগণ আস্থাহীন। কিন্তু শাসকের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন কখনোই অরাজনৈতিক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ রাজনীতি হল রাজা অর্থাৎ শাসকের নীতির পক্ষে অথবা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া। এখানে শাসকের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ অবশ্যই রাজনীতি। এই সমালোচনা জনতার মধ্য থেকে (তাদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশের থেকে) সামনে আসায় জুনিয়র ডাক্তাররা এই 'অরাজনৈতিক' নাগরিক আন্দোলনের অর্থ করেছেন দলীয় রাজনীতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠা আন্দোলন। এই ধারণাটাও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত জনগণ তাতে সায় দিয়েছেন। কারণ এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রগতিশীল শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রয়োজন। এই নেতৃত্বের প্রশ্নটি পরবর্তীতে সিনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে শোনা গেছে।

যখন এই আন্দোলন তুঙ্গে সে সময় সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির কায়েমী স্বার্থকে অস্বীকার করে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী সহ জনতার যৌথ নেতৃত্বে যে জনস্বাস্থ্যের আন্দোলন এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার গণআন্দোলনের সম্ভাবনা পুরোপুরি তৈরি হয়েছিল। এত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই গুণাত্মক রূপান্তর চাইছিল। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিছুতেই জুনিয়র ডাক্তার ও সিনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচী এক দিনে এক হচ্ছে না। প্রতিক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল সিনিয়র ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম ইস্তফা দেবার হুমকি থেকে শুরু করে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির সময় দুই শিফট-তিনশিফট ডিউটি করে অভিভাবকের মতো আন্দোলনকারীদের আগলে রেখেছেন। পাশাপাশি নিজেদের কর্মসূচী কাটছাঁট করে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেছেন। এইভাবে তারা একদিকে ঐক্য বজায় রাখা আর অন্যদিকে কনভেনশনে বারবার বলেছেন যে এই আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদী। এতে সাফল্য পেতে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে মোর্চা তৈরি করে যৌথ নেতৃত্বে এগোতে হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এমন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মঞ্চ গড়ে ওঠেনি। জুনিয়র ডাক্তাররা যেহেতু অনেকগুলো সংগঠনের যৌথ ফ্রন্ট, তাই কাদের জন্য এই কর্মসূচী রূপায়িত হল না তা সাধারণ মানুষের জানা নেই। তবে আন্দোলনকারী প্রগতিশীল জনতা সঠিক পথ খুঁজছেন।

ডক্টরস্ ডায়ালগ নামক অনুষ্ঠানে ডঃ অর্নব সেনগুপ্ত বলেছেন – "১৪ই অগাস্টে যা দেখেছি অভূতপূর্ব। রিমঝিমের কলে (১৪ই অগাস্ট রাত দখলের ডাক দেন যিনি) কয়েক কোটি লোকের মধ্যে ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং প্রসারতা লাভ করে। ... এর পরবর্তীতে মাসখানেক জুড়ে প্রত্যেকদিন জনসমাগম হয়েছে। এমনকী গভীর রাতেও।

এমন একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে প্রতিটি মেয়ে, প্রতিটি মা এবং বাবা কোথাও প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন, যেখানে এরকম একটা 'সেফেস্ট হেভেন' এরকম একজন কর্তব্যরত মহিলা, যে বিভৎসতায় হত্যা হয়েছিল, এটা তাদের সবারকার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে একটা ব্যাপক, একটা জেন্ডার ইস্যুর মুভমেন্ট কিন্তু হয়েছিল সে সময়। ... কিন্তু যেহেতু এই আন্দোলনটা প্রাইমারিলি লিড করছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা, কারণ তারা কর্মবিরতি করেছিলেন, তাদের সহকর্মী হত্যার কারণে, আরো নানা রকমের আন্দোলনের স্টেপ নিয়েছিলেন, আমরা সিনিয়র ডাক্তাররা সঙ্গে ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ডাক্তাররা

(প্রধানত জুনিয়র ডাক্তাররা)। যেহেতু তাদের ঘটনা, তাদের ইন্সটিটিউশনের ঘটনা, সেখানে প্রোটেকশন বা নিরাপত্তার যে বিষয়গুলো, সেটা প্রধানত যেটা হয়ে যায় পরবর্তীকালে সেটা কিন্তু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভিত্তিক যে সেটাপ তার মধ্যে কি করে একজন চিকিৎসক, বিশেষ করে একজন নারীচিকিৎসক কাজ করতে পারেন সিকিওর্ড অবস্থায়, তার বিভিন্ন ব্যবস্থাটাই মূল হয়ে যায়। এমনকী জনসাধারণের দাবি যদি বলি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দাবি, সেটা যে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল, এটা আমি বলতে পারবো না। তার কারণ স্বাস্থ্য আন্দোলনের যে দুটো দাবি ছিল, যে বেড ভ্যাকেন্সি সিস্টেম, আর সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম – এই দুটো দাবি এসেছে, ফান্ডামেন্টালি এসেছে নিরাপত্তার জায়গা থেকে। তার কারণ বেড ভ্যাকেন্সি থাকে না বলে, এই সংক্রান্ত সঠিক ইনফরমেশন থাকে না বলে রুগীদের খুব অসুবিধা হয়। ক্ষোভ থেকে ডাক্তারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। বা রেফারেল সিস্টেম ঠিক মতো চলে না বলেই রুগীদের খুব অসুবিধা হয়। তার থেকে ডাক্তারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই এই যে দুটো পাবলিক ডিমান্ড বলে এখানে বলা হয়েছে, সেটা র‍্যাদার আই শুড সে ইট ইজ ইনসিডেন্টাল। অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টাই আসপেক্ট। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দাবি আছে, জনগণের চিকিৎসাপ্রাপ্তির বুনিয়াদী মানোন্নয়নের জন্যে, সেখানে মানবাধিকারটাই লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, তাকে প্রচন্ড রকম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, একটা আউট ডোরে টিকিট কেটে টেস্ট করতে গিয়ে তাকে আলাদা আলাদা করে ডেট নিতে গিয়ে নিজের আয়কে সেকেন্ডারি করে প্রতিদিন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সৌভাগ্যবান হয়ে যদি ভর্তি হতেও হয়, ভর্তির পরেও সাত থেকে পনেরো দিন হাসপাতালে ওটি লিস্টে নাম লিখে বসে থাকা, দেরি হয়ে যাওয়া – এরকম সমস্ত হয়রানি হতে হয়। শুধু চিকিৎসা প্রাপ্তিই নয়, চিকিৎসকদেরও প্রচন্ড হিউম্যানরাইট অ্যাবিউজাল হয়। ... কিন্তু এই সমস্ত দাবিদাওয়া আমাদের আন্দোলনের মুখ্য দাবিদাওয়ার মধ্যে আসে নি।" ডঃ সেনগুপ্তের মূল্যায়ন অনুযায়ী জনগণের সমর্থনের প্রধান দিক ছিল জেনডার ইস্যু। তিনি বলেছেন – "সেই দাবিগুলিকে সত্যি সত্যি গত নব্বই দিনের আন্দোলনে, চিকিৎসকদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলেছে তাতে যে খুব একটা চ্যামপিয়ন্ড হয়েছে, এ কথাটা বলা যায় না। এটা মেনে নিতেই হবে। এখানে আমার একটা আক্ষেপের বিষয় আছে, এই স্বতঃস্ফূর্ত, হয়তো নেতৃত্বহীন আন্দোলন থেকে কিন্তু আমরা আরো বড় সোসাল রিফরমেশন বা আরো বড় সামাজিক সংস্কারের ইস্যুকে তুলে আনতে হয়তো বা পারতাম। ... মানুষকে নিয়ে যৌথ নেতৃত্বে (people at large) তাদের যৌথ নেতৃত্বে যে সামাজিক আন্দোলন তার প্রচেষ্টাটা অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। আমাদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর উদ্যোগে যে অভয়া মঞ্চ তৈরি হয়েছে, যাতে ইতিমধ্যে প্রায় একশো জনসংগঠন জড়ো হয়েছে, সেটা কিভাবে কতদূর আমরা সাকসেসফুল করতে পারি, সেটা দেখতে হবে।" শুধুমাত্র জেন্ডার ইস্যু নয় এই অভূতপূর্ব গণআন্দোলন গণবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বহুযুগ ধরে খুন, ধর্ষণ আর সর্বস্তরে দুর্নীতি ও হুমকী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, নিপীড়ণের বিরুদ্ধে জনতার মধ্যে চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। অভয়ার ন্যায় বিচার-এর লড়াই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

২৬শে অগাস্ট থেকে অভয়া মঞ্চ পর্যন্ত আমরা আরো দুটো গণকনভেনশন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। দুটোতেই সিনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে ডঃ অর্নব সেনগুপ্ত এবং ডঃ পুন্যব্রত গুণ যৌথমঞ্চ গড়ার ডাক দিলেও, বাস্তবিক তা করা হয় নি। বাধ্য হয়ে সিনিয়র ডাক্তারদের পাঁচটি সংগঠন নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে অভয়া মঞ্চ গড়ে তুললেন।

এখন অভয়া মঞ্চ তৈরি হলেও যাদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস্ ফ্রন্ট এর অংশীদার নয়। এটা একটা সমস্যা। তবে জানা গেছে যে জুনিয়র ডাক্তারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অভয়া মঞ্চের পক্ষে। কিন্তু জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে সাথে নিয়ে যদি লোহা গরম থাকাকালীন হাতুড়ি চালানো যেত (যৌথমঞ্চ গড়া যেত), তবে বৃহত্তর জন নেতৃত্ব নতুন দিশা দেখাতো। লোহা ঠান্ডা অবস্থায় অভয়া মঞ্চ কতদূর সাফল্য পাবে সেটা আগামী ভবিষ্যৎ বলবে।

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের মুখ্য দাবি নিছক দ্রুত বিচার করে দোষীদের শাস্তির দাবি নয়। মুখ্য দাবি ন্যায় বিচারের দাবি। জনগণের অভিজ্ঞতা হল এই সমাজে যে লাগাতার অবিচার ও অন্যায় হয়ে চলেছে তার ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না। সিবিআই, ন্যায়ালয়, পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকায় আন্দোলনকারী জনতার একাংশকে ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রশ্নে যেমন হতাশ করেছে তেমনই রাষ্ট্রের উপাঙ্গগুলির উপর আস্থাহীনতাও সৃষ্টি করেছে। জনতার একাংশ মনে করছে গণআন্দোলনের প্রবল ঝড়ে বলপূর্বক ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনা ছাড়া অন্য পথ খোলা নেই। জনগণের মনে আশা উদ্রেককারী অভয়ামঞ্চ কিভাবে এবং কতটা প্রত্যাশা পূরণ করে এখন সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।■

অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলন ও জনতার প্রতিক্রিয়া

মিছিলের পিছন পিছন বাসগুলো গুটি গুটি করে বেহালা ১৪ নং বাসস্ট্যান্ডের আগে এসে সার দিয়ে লম্বা লাইন করে দাড়িয়ে আছে। অগাস্ট মাস, দর দর করে ঘামছেন সকলে, তবুও কোন বিরক্তি নেই। উঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা আর কতক্ষণ সময় লাগবে। একজন যাত্রী সাদা পোশাক পরা পুলিশগুলোর দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন – "সব এদের কারসাজি, বাস কন্ডাক্টর পুলিশদের রিকোয়েস্ট করে বলেছে তারা জেমস লং বাইপাস দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবে, কিন্তু পুলিশগুলো তা করতে দেয়নি বরং ইচ্ছা করে মিছিলের পিছন পিছন যেতে বাধ্য করেছে। যাতে আমরা বিরক্ত হই"। অপর একজন যাত্রী বলে উঠলো –"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমাদের এই আন্দোলনের প্রতি বিরক্ত করার চক্রান্ত এ-সব।" রাস্তার পুলিশরা আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে এদের। হঠাৎ একজন বয়স্ক মহিলা বুক চাপড়ে বলে উঠলেন – "অভয়া আমার মেয়ে ছিলো রে, আমার মেয়ে। শয়তান পুলিশ মেরে ফেলেছিস তোরা ওকে, এখন প্রমাণ লোপাট করছিস। আর আমরা যাতে বিরক্ত হই সেই কারসাজি করছিস? আমরা বিরক্ত হব নারে, আমরা বিরক্ত হব না।"

ওপরের এই উক্তি কোন বোদ্ধা মহিলার নয়, নেহাতই সাধারণ ঘরের এক মহিলা, যার সারাটা জীবন কেটে গেছে সংসারের যাতা-কলে পিশে। তবুও অভয়া বলুন আর তিলোত্তমাই বলুন তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। অভয়া এখন বাংলার প্রতিটা মানুষের মেয়ে, বোন, দিদি। তাইতো স্লোগান উঠেছে – **"ঘুমিয়ে নিজে জাগিয়ে দিলি, ভয়-ডর সব ভাগিয়ে দিলি"**। মানুষ তার প্রতিবাদ জানাতে মিছিল খুঁজেছে। সমাজের সকল বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে মহিলারা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে।

স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তাররা যখন অবস্থান করছেন, সেন্ট্রাল পার্ক থেকে স্বাস্থ্যভবনের মিছিলে যখন হাজার হাজার মানুষ হাঁটছে, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি সমানে পড়ছিলো। তখন ছাতা বিহীন একজন মহিলা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বললেন – 'জীবনে এই প্রথম মিছিলে হাঁটছি, ছেলে-মেয়েগুলো কি কষ্ট করে রয়েছে সুবিচারের দাবিতে, আর আমরা এটুকু হাঁটতে পারবো না?" – স্লোগান উঠলো – **"যতই আসুক বৃষ্টি-ঝড়, জাস্টিস ফর আর জি কর।"**

শ্যামবাজারের মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে একজন ভদ্রমহিলা বললেন – "মাননীয়া নিজে বলেছেন দোষীদের ফাঁসি চাই, আর দোষীদের হয়ে ৩৪ জন উকিল লাগিয়েছেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে দোষীদের বাঁচাচ্ছে, এটা দ্বিচারিতা নয়?" পাস থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন – "এই যে উকিলের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এগুলো কাদের টাকা? আমাদের টাকা, আমাদের টাকা দিয়ে সরকার ধর্ষকদের বাঁচাচ্ছে।" স্লোগান উঠেছে – **"রাষ্ট্র বাঁচায় ধর্ষককে, রাষ্ট্রই ধর্ষক।"**

সুপ্রিম কোর্টের প্রথম শুনানির পর ঘরে-বাইরে, রাস্তা–ঘাটে প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়ে। একটি অটোতে যখন পাবলিক এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে, অটো চালক বললেন – "সব সেটিং হয়ে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট ৫ মিনিটের মধ্যে পরের ডেট জানিয়ে দিলো, আর জুনিয়র ডাক্তারদের বললো – কাল ৫টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে, না হলে রাজ্য সরকার যা ব্যবস্থা নেবার নেবে। এটা সেটিং। সরকার চন্দ্রচূড়কে টাকা খাইয়েছে। কিচ্ছু হবে না শেষ পর্যন্ত।" অটোতে থাকা এক মহিলা বললেন – "এই বিচার ব্যবস্থায় কিছু হবে না, আমাদের মহিলাদের হাতে ছেড়ে দিক, আমরাই বিচার করবো।"

অক্টোবর মাসে পূজোর সময় জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্মতলায় আমরণ অনশন করে একের পর এক অসুস্থ হয়ে আইসিইউ-তে ভর্তি হচ্ছেন। তখন ধর্মতলায় ঐ অবস্থানে প্রচুর মানুষ ভিড় করে আছে প্রতিদিন। ঘিরে রেখেছে এদের, বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মহিলারা। একদিন একজন বয়স্ক মহিলা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে গেলে জুনিয়র ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেন। ওনার স্বামী নিয়ে এসেছেন তাঁকে। জানালেন – উনি ক্যান্সার আক্রান্ত, খুবই সিরিয়াস অবস্থা। ভদ্রমহিলা একটু সুস্থ হয়ে বললেন – "আমার তো অবস্থা শেষের দিকে, যাবার আগে এই ছেলে মেয়েগুলোকে দেখে যাই একবার। এটাই শেষ পুজো আমার, এরাই তো আমার ঠাকুর" এবার পুজোয় আকাশে-বাতাসে একটা স্লোগান ধ্বনিত হয়েছিল –

'দালালি না রাজপথ – রাজপথ, রাজপথ।
আপোষ না সংগ্রাম – সংগ্রাম, সংগ্রাম।
উৎসব না বিপ্লব – বিপ্লব, বিপ্লব।'

পুলিশে কর্মরত নিচু তলার এক পুলিশকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় – আসল ব্যাপারটা কি? তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বলেন – "সঞ্জয় তো চুনোপুঁটি মাত্র, আসল ঘটনা কি? কারা ঘটিয়েছে? তা আর জি করের মাথারা, মন্ত্রীরা, পুলিশের বড়কর্তারা সবাই সবটা জানে। সবই প্ল্যান করে ধামা-চাপা দেওয়া হচ্ছে।" এক পুলিশ স্বামীকে তার স্ত্রী ঝগড়া করে বলতে শোনা গেছে – "তোমরা অন্যায়ের সাথ দাও, সব চটি চাটার দলে।" তার পুলিশ স্বামী তাকে বলেছে – "ওপর থেকেই সব সেটিং হয়ে যায়, আমরা আদেশ পালন করি শুধু।"

শ্রমজীবী অঞ্চলে, শ্রমিক বস্তিতে অনেক কথাই শোনা যায় অভয়া কান্ড নিয়ে, "হাসপাতালে রুগীগুলোকে মেরে দিয়ে তাদের কিডনি, লিভার আরও অনেক অঙ্গ পাচার হয়'। 'আমরা তো মুর্খ মানুষ কিছুই বুঝি না।' 'মেয়েটা সেগুলো সব জেনে গিয়েছিল,

বিজ্ঞানের খবর

অগাস্ট, ২০২৪ ঃ

৭ ●অস্ট্রেলিয়ার একদল সমুদ্র বিজ্ঞানী প্রবাল সাগরের বিগত ৪০০ বছরের তাপমাত্রার তথ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই তথ্য পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে সমুদ্রের উচ্চ স্তরের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর ফলে ঐ গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের সামুদ্রিক উদ্ভিদকূল ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। (নেচার)

৮. ●মঙ্গল গ্রহের তাপমাত্রা −১৫৩° সে থেকে ২০° সে। গড় তাপমাত্রা হল −৬৫° সে। এই তাপমাত্রা মানুষের বসবাসযোগ্য নয়। মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রাকে বৃদ্ধি ঘটিয়ে কিভাবে মানুষের সহনশীল করা যায় এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব আছে। এতদিন যে তত্ত্বটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল তা হল, বায়ুমন্ডলের সাথে গ্রীন হাউস গ্যাস মিশিয়ে দেওয়া। সম্প্রতি নর্থওয়েস্ট চিকাগো ও সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রযুক্তিবিদ ও ভূপদার্থ বিজ্ঞানী একটি মডেল উপস্থাপনা করে দেখিয়েছেন যে ধাতু নির্মিত ন্যানোরড ব্যবহার করে মঙ্গলের তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে, ন্যানোরড গ্রীন হাউস গ্যাসের চেয়ে দ্রুতগতিতে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। (phy.org)

১২. ●মঙ্গলের মাটির ১০-১২ কিমি গভীরে তরল জলের সন্ধান পেলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। স্মরণ করা যেতে পারে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা প্রেরিত 'ইন্সাইট' ল্যান্ডার ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলে অবতরণ করে। তারপর থেকে লাগাতার গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা ঐ গ্রহের মেরু অঞ্চলে বরফ ও বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। এবার বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের বুকে প্রায় ১৩১৯টি সিসমিক কম্পন পরীক্ষা করে মাটির নিচে জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। (বিবিসি নিউজ)

●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আকারের একটি বহির্গ্রহকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তার আয়ু আর মাত্র ৪০ কোটি বছর। এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছেন যে বহির্গ্রহটি কক্ষপথ নিকটবর্তী নক্ষত্রের অত্যন্ত কাছাকাছি এবং ঘূর্ণনকাল মাত্র ৫.৭ ঘন্টা। প্রবল মহাকর্ষীয় বলের ফলে গ্রহটি ক্রমশঃ ডিম্বাকৃতি হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন গ্রহটি ধীরে ধীরে এই বল সহ্য করার ক্ষমতা হারাবে ও তার ধ্বংসের কারণ হবে। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

১৪. ●গত দু-বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাঙ্কি পক্স-কে আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য জরুরী ঘোষণা করল। সম্প্রতি

➔

● ... *জনতার প্রতিক্রিয়া*

আর সবাইকে বলে দেবে বলেছিলো, ... সেই জন্যই তো ওকে কষ্ট দিয়ে মারলো কর্তৃপক্ষ, প্রমাণ লোপাট করলো। ... সাচ্চা মানুষদের তো এইভাবে মেরে ফেলা হয়।"

আবার শ্রমজীবী অঞ্চলে চা বিক্রি করে এক মহিলা যার জামাই একজন সার্জেন্ট, তিনি আবার বলেছেন – "কেনো যে সবাই এতো হৈ-চৈ করছে, দিদি তো বলেছে – দোষীরা শাস্তি পাবে, আর সেই জন্য তো উনি অনেক কিছু করছেন, তবু লোকের তর সয় না।"

বিভিন্ন মিছিলে পা মিলিয়েছেন, এই রকম কিছু মহিলার বক্তব্য শোনা যাক। "আমি মিছিলে হেঁটেছি, এখনো হাঁটছি, ভবিষ্যতেও হাঁটবো। অভয়া যদি আমাদের ঘরের মেয়ে হতো – তাহলে কি হতো? এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা দরকার যতক্ষণ না পর্যন্ত সমাজ থেকে এই অন্যায় নির্মূল না হয় ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আমি মেয়ের মা, আমার মেয়ের জন্য, সব মেয়ের জন্য লড়াই করছি, করবো।" জনৈক একজনের মতে – "আমার মা কোনদিন আমাকে মেয়ে বলে নি, ছেলেও বলেনি একজন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছে। ভবিষ্যত প্রজন্মকেও সেই ভাবেই গড়ে তুলতে হবে।"

অভয়ার মৃত্যুর এখন ১০০ দিন পার হয়ে গেছে মানুষ বিভিন্ন সরকার, রাজনৈতিক দল সকলের ওপরে আস্থা হারিয়েছেন। তবে বিচার ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট এদের ওপর যারা কিছুটা আস্থা রাখতেন তারাও এতদিনে বুঝে গেছেন ন্যায় বিচার আর আইন এক ব্যাপার নয়। কিছুটা হতাশ হলেও এখনো হাল ছাড়তে রাজী নয়। তাই তো একজনের কথায় – "আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নারী নিগ্রহ দেখে আসছি ঘরে-বাইরে, অফিসে, আদালতে। কিন্তু তার প্রতিকার খুঁজতে যাইনি বা পাইনি। আজও ২০২৪-এ দাড়িয়ে অভয়ার মতো এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো, আমরা সমস্ত রাজ্য রাস্তায় নেমেও, পথে নেমেও সারা রাত জেগেও কিছু করতে পারছি না। সেটা আমাদের একটা বড় ব্যাথার জায়গা। তবে এই আন্দোলনের একটা ভালো দিকও আছে আমরা একটা মঞ্চ পেয়েছি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি। যখন আমরা এতো বছর পরেও এই জায়গাটা পেয়েছি আশা করবো আমরা সবাই সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, লাগুক না আরও ১০০ বছর। তবু আমরা আশায় থাকবো কোন একদিন নারীমুক্তি আসবে। শুধু নারীমুক্তি কেন সমাজের মুক্তি হবে। আমরা যে সমাজে রয়েছি সেই সমাজটা ঠিক নয় বলে নারীরা সুরক্ষিত নয়। আশা রাখছি আগামী দিনে আমরা স্বাধীন হবো। প্রকৃত অর্থে অভয়া সেদিন বিচার পাবে।" ■

আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো-তে এই ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করে ও পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। (রয়টার)

●স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের কয়েকজন বিজ্ঞানী মানুষের বার্ধক্য বিষয়ে এক অভিনব গবেষণা করেছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন মানুষের বার্ধক্যের গতি সব সময় একই থাকে না। বিশেষতঃ দুটি সন্ধিক্ষণে বার্ধক্যের গতি হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ১০৮ জন স্বেচ্ছা সেবকের উপর দীর্ঘ সাত বছর পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ৪৪ ও ৬০ বছর বয়সে পেশী-অস্থির সমন্বয় (মাস্কিউলো-স্কেলিট্যাল) ও হৃৎপিণ্ড ও রক্তপ্রবাহ সংক্রান্ত (কার্ডিওভাস্কুলার) দ্রুত বিঘ্নিত হবার কারণে মানুষের বার্ধক্য রাতারাতি বৃদ্ধি পায়। (দ্য গার্ডিয়ান)

১৬. ●১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অগাস্ট আমেরিকার ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এক বিশেষ ধরনের শক্তিশালী রেডিও সংকেতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। যার নামকরণ করা হয় 'ওয়াও সিগন্যাল'। সেই সময় অনেকে মনে করতেন ঐ সংকেত বহির্জাগতিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কোন উৎস হতে প্রেরিত। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে নক্ষত্রের বিকিরণ-এর কারণে এই সংকেতের সৃষ্টি হয়। (প্ল্যানেটারী হ্যাবিটাবিলিটি ল্যাবরেটরি)

২৩. ●ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য এম আর এন-এর প্রতিষেধকের ট্রায়্যাল শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। বিএনটি১১২ নামক প্রতিষেধকটির ট্রায়্যাল একসাথে পৃথিবীর সাতটি দেশে শুরু হয়েছে। ফুসফুস ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এমন উদ্যোগ আগে কখনো নেওয়া হয়নি। (দ্য গার্ডিয়ান)

সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ঃ

৪. ●ইউরোপ ও জাপান-এর মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যৌথভাবে শুক্রগ্রহ ফ্লাই বাই অভিযান চালাচ্ছে। তাদের চতুর্থ মিশনের মহাকাশযানকে শুক্রের নিকটতম দূরত্বে আনতে সক্ষম হয়েছে। ঐ সংস্থাদ্বয় জানাচ্ছে যে মহাকাশযানটি শুক্র হতে মাত্র ১৬৫ কিমি দূরত্ব দিয়ে ওড়াতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। (ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী)

১০. ●সুইডেনের একদল গবেষক কার্বন ফাইবার দিয়ে ব্যাটারী নির্মাণ করতে সফল হয়েছেন। এই ব্যাটারী অ্যালুমিনিয়াম-এর মতো কঠিন কিন্তু হালকা। এতে কম্প্যুটারের ওজন প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। প্রযুক্তিবিদরা জানাচ্ছেন যে এই ব্যাটারীর কর্মদক্ষতা এতটাই যে তা ব্যবসায়িকভাবে সফল হবে ও খুব দ্রুত বাজারে আসবে। (ইউরেক অ্যালার্ট)

১১. ●জার্মানিতে অতিকায় সুপার কম্প্যুটার 'জুপিটার' ব্যবসায়িকভাবে বাজারে এসে গেল। ইউরোপে এই প্রথম এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। এই সুপার কম্প্যুটার সেকেন্ডে $১০^{১৮}$ গণনা করার ক্ষমতা রাখে। (ইনসাইড এইচ পি সি)

১২. ●আমেরিকার এক ব্যবসায়িক জারেদ আইজ্যাকম্যান পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হিসাবে নিজের খরচে মহাকাশে বিচরণ (স্পেস ওয়াক) করে এলেন। পোলারিস ডন মিশন-নামক এক সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং স্পেস এক্স সংস্থা নির্মিত বিশেষ পোশাকে আইজ্যাকম্যানের মহাকাশ সঙ্গী ছিলেন একজন স্পেস এক্স সংস্থার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সারা গিলিস। (দ্য গার্ডিয়ান)

১৬. ●ল্যানসেট পত্রিকার একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২০২৫ থেকে ২০২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে ৪ কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে, ব্যাক্টিরিয়া আক্রমণজনিত বহু রোগের উপশম হয়েছে নিশ্চিতভাবে। তবে পাশাপাশি ব্যাক্টিরিয়া এই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, রোগ সারাতে গেলে বৃদ্ধি করতে হয় ওষুধের মাত্রা। (সিএনএন)

১৯. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর দ্বিতীয় 'চাঁদ' আবিষ্কার করেছেন, তবে তা খুবই ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত ছোট আকারের 'চাঁদ'টি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে স্বস্থানে ফিরে গেছে। নিকটবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জ হতে আগত 'চাঁদ'টি ২০৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবার পৃথিবীর 'চাঁদ' হয়ে ফিরে আসতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। (দ্য গার্ডিয়ান)

২৩. ●ডর্টমুথ-এর প্রায় ৫০ জন আবহাওয়া বিজ্ঞানী এক গবেষণায় জানিয়েছেন যে বর্তমানের কার্বন নিঃসরণের হার বজায় থাকলে ২৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পশ্চিম কুমেরু অঞ্চলের সমস্ত বরফ লোপ পাবে। (ডর্টমুথ কলেজ)

৩০. ●**জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিখের লুডউইক-ম্যাক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ও ডর্টমুথের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা মিলিতভাবে এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যার দ্বারা ন্যানোকণা এবং ভাইরাসের অস্তিত্ব অতি দ্রুত জানা যাবে। ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং মাইক্রোস্কোপিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা এই সাফল্য পেয়েছেন।**(phy.org)

অক্টোবর, ২০২৪ ঃ

২. ●বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার মাছির মস্তিষ্কের ম্যাপিং সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ ক্ষুদ্র মাছির মস্তিষ্কে প্রায় ১.৪ কোটি নিউরোন দ্বারা গঠিত প্রায় ৫ কোটি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এই গবেষণা আগামীদিনে উচ্চ প্রজাতির স্নায়ুতন্ত্রকে আরও বিশদভাবে জানতে সাহায্য করবে। (রয়টার)

৪. ●বিজ্ঞান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এমন কৃত্রিম গাছ বানাতে সক্ষম হয়েছেন যা সালোক-সংশ্লেষ ও শ্বসন করতে সক্ষম। এমনকি তড়িৎ উৎপাদন করতেও সক্ষম। গাছের পাতাগুলি জৈব সৌর-কোষ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিভিন্ন রকম জৈব কাজকর্ম সম্পন্ন করে। (বিজ্ঞান্টন বিশ্ববিদ্যালয়)

১১. ●জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ একটি ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছে যার আয়তন আমাদের আকাশ গঙ্গার একশ ভাগের এক

ভাগ। তা সত্ত্বেও সেটি আকাশ গঙ্গা-র থেকে অনেক বেশি পরিণত ও জটিল, যার মধ্যিখানে নক্ষত্র-ঘনত্ব অনেক বেশি ও চারিপাশে ঘনত্ব ক্রমশঃ কম। বিজ্ঞানীরা এর রহস্য খুঁজছেন। (phy.org)

নোবেল পুরস্কার, ২০২৪ ঃ

এই বছর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নাম নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানে দু'জন, রসায়নে তিনজন ও শারীর ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে দুজন বিজ্ঞানীকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

●**পদার্থ বিজ্ঞান –** এই বছর বিজ্ঞানের এই শাখায় পুরস্কার অর্জন করেন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড এবং কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানী জিওফ্রে ই হিনটন। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র-এর ক্রিয়াকৌশল সদৃশ কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শক্তিশালী মেশিন লার্নিং-এর ভিত্তি স্থাপন করার জন্য যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন এই দুই বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফলে যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কারণ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য পুনরুদ্ধার ও তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে যন্ত্রের বিচক্ষণতার বিকাশ ঘটেছে। পৃথিবী মেশিন লার্নিং যুগ থেকে ডিপ লার্নিং যুগে প্রবেশ করেছে ও যন্ত্রমেধার প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। শিল্প-উৎপাদন, চিকিৎসা ক্ষেত্র, যান নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্র, ব্যাঙ্ক পরিষেবা, জালিয়াতি প্রতিরোধ, জলবায়ু বিজ্ঞান, ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ক্ষেত্রসহ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে যন্ত্রমেধার ধারাবাহিক প্রয়োগের ফলে মানুষের শ্রমলাঘব ঘটেছে। বিজ্ঞানের দুনিয়ার এই অগ্রগতি ঐ দুই বিজ্ঞানীর প্রায় চার দশকের গবেষণার ফসল।

●**রসায়ন –** এবছর তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানীকে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস। এঁরা হলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার। বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার কম্প্যুটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনিং বা গণনামূলক পদ্ধতিতে প্রোটিনের গঠন জানার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানী ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার মেশিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে প্রোটিন অণুর গঠন কি হতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এর ফলে, আগামীদিনে জেনেটিক্স, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, ড্রাগ প্রস্তুতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রের অগ্রগতি ঘটবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

●**শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান –** দুই মার্কিন জীব বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যাম্ব্রোজ ও গ্যারী রুডকুন মাইক্রো আর এন এ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আবিষ্কারের জন্য এই বছরের নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। বহুকোষী জীবের দেহে জিন নিয়ন্ত্রণের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে আরো সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য এই তত্ত্ব কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। (বিবিসি নিউজ) ■

ঃ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

অনেক সময় শসা তেতো হয় কেন?

শসা অত্যন্ত পুষ্টিকর এক ফল। আমাদের অনেকেরই ভারি পছন্দের ফল। টিফিনে, লাঞ্চে বা ডিনারে অনেকে শসা খান। তাছাড়া স্যালাড হিসাবে শসার খ্যাতি বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু বাজারহাটে শসা কেনার সময় মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক দেয়, শসা তেতো হবে না তো! ফেলে দিতে হবে না তো!

তাই কেনার সময় আমরা দোকানদারকে বলি – ভাই শসা তেতো হবে না তো?

- না দাদা নিয়ে যান, এ শসা তেতো হবে না।

কিন্তু বাড়িতে নিয়ে খেয়ে দেখি সেটাও তেতো! এ অভিজ্ঞতা কমবেশি আমার আপনার বা অনেকেরই।

এখন জানা যাক কেন শসা তেতো হয়। গবেষণা বলছে এর জন্য দায়ী মূলত শসায় থাকা এক রাসায়নিক, নাম কিউকারবিটাসিন বি বা সি। বিভিন্ন কারণে শসা গাছের স্ট্রেস বা চাপ তৈরি হয়। তখন গাছের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গাছ বেশি বেশি কিউকারবিটাসিন উৎপাদন করে।

কিউকারবিটাসিন উৎপাদন করার সম্ভাব্য কারণগুলি হলো –

১. মাটির পুষ্টির ভারসাম্য বজায় না থাকা, মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ মাটির পুষ্টির স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাছাড়া নাইট্রোজেন বা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান বেশি হলেও শসা গাছের বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যাহত হতে পারে এবং এ থেকে গাছের মধ্যে কিউকারবিটাসিন মাত্রা বেড়ে যায়।

২. অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ঃ জমিতে অতিরিক্ত সার দিলে গাছের মধ্যে অক্সিডেটিভ স্টেস হতে পারে, যা গাছের প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়া সক্রিয় করে। এর ফলে কিউকারবিটাসিন উৎপাদন বাড়ে, কারণ কিউকারবিটাসিন গাছের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষামূলক পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

৩. জলের ঘাটতি – ক্ষেতের মাটিতে জলের ঘাটতি হলেও গাছের স্ট্রেস হয়। সেই সাথে অতিরিক্ত সার দিলে মাটির কৌশিক জলের ঘনত্ব বাড়ে, সেই জন্য গাছের জল শোষণের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে গাছে জলের ঘাটতি হয়। জলের ঘাটতি গাছের স্ট্রেস সৃষ্টি করে, আর আগেই বলেছি যেকোনো রকম স্ট্রেসে কিউকারবিটাসিনের উৎপাদন বাড়ে।

এই কারণে শসা উৎপাদনে সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। সঠিক পরিমাণে এবং সুষমভাবে সার প্রয়োগ করে শসার মধ্যে কিউকারবিটাসিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তখন স্ট্রেস জনিত কারণে শসা তেতো হবে না।

বাজার থেকে কিছু শসা এনে একটি কেটে খেয়ে দেখলেন তা

অনেকটা তেতো। তখন কি ওই শসা খাওয়া যাবে?

একটি শসা কেটে খেয়ে যদি তেতো লাগে তাহলে তেতো কমানোর একটা উপায় আছে। আমরা মা-ঠাকুমাকে দেখেছি, শসার দুদিকে সামান্য কেটে সেই কাটা অংশ দিয়ে কাটা অংশে খানিকক্ষণ ঘষতেন। তখন সেই কাটা অংশ দিয়ে এক ধরনের সাদা ফেনা বের হতো। যতক্ষণ না এই সাদা ফেনা বের হওয়া থামছে, ততক্ষণ ঘষতেন। তারপর ভালো করে জলে ধুয়ে ফেলতেন। তেতো অনেকটা কমে যেত। এটা এখনও কেউ কেউ করেন। এর কারণ কিউকারবিটাসিন মূলত শসার দুই প্রান্তে আর ফলত্বকে বেশি থাকে। তাই দুই প্রান্ত কেটে ঘষলে কাটা অংশ দিয়ে অনেকটা কিউকারবিটাসিন বের হয়ে আসে। তাতেই তেতো কিছুটা গায়েব। তবে এমন অনেক তেতো শসা আছে যার দুদিক কেটে ঘষাঘষি করলেও তেতো যায় না। এখন প্রশ্ন হলো তেতো শসা খাওয়া কি ঠিক হবে? সামান্য তেতো শসা খাওয়া যেতে পারে কিন্তু শসা বেশি তেতো হলে তাতে অত্যধিক কিউকারবিটাসিন শারীরিক কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন – বমি, ডায়রিয়া বা পেট ব্যথা হতে পারে। অতি উচ্চ মাত্রার কিউকারবিটাসিন স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব ফেলে পেশির খিঁচুনি বা দুর্বলতা তৈরি করতে পারে। সেই সাথে মাথা ঘোরা, রক্তচাপ কমে যাওয়া এবং স্নায়বিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

তেতো হয় না এমন শসাও তো বাজারে পাওয়া যায়! এটা কেন?

এর কারণ শসার জাতেরও রকমফের আছে। আর তাছাড়া শসা তেতো হবে কি হবে না তা অনেকটাই নির্ভর করে কীভাবে শসার চাষ করা হচ্ছে তার উপর, তা আগেই বলেছি। তাছাড়া এখন জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তেতো হবে না এমন জাতের শসা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মূলত তা জেনেটিকালি মডিফায়েড। সাধারণ শসা গাছ চাষের সময় স্ট্রেস না থাকলে শসা তেতো হবে না। তাই শসা চাষের সময় শসা গাছকে চাপে বা স্ট্রেস রাখা যাবে না। বেশি চাপে পড়লে সে চাপমুক্ত হওয়ার জন্য বেশি বেশি কিউকারবিটাসিন তৈরি করবে। তখন শসা তেতো হবে। তাই অনেক যত্ন নিয়ে অনুকূল অবস্থায় শসা চাষ করতে হবে। মানে মাটিতে জল কম থাকলে বা জল খুব বেশি থাকলে বা প্রথমে চাষের শুরুতে জল বেশি আর পরে জল কম বা প্রচুর সার প্রয়োগ করলে শসা তেতো হতে পারে। হঠাৎ করে খুব গরম পড়লে জলের ঘাটতিতেও শসা গাছে স্ট্রেস তৈরি হতে পারে। আর শসা গাছে যত বেশি স্ট্রেস তৈরি হবে, সেই স্ট্রেস কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা হিসাবে তত বেশি কিউকারবিটাসিন তৈরি করবে; তত শসা তেতো হবে।

মহাবিশ্বের সব কিছু স্থির না হয়ে গতিশীল কেন?

এখন আমরা জানি, মহাবিশ্বের সব কিছু গতিশীল। প্রচন্ড ধাবমান। একসময় অবশ্য মানুষের ধারণা ছিল, মহাবিশ্বটা নিজে স্থির। একভাবেই রয়েছে অনন্তকাল। কখনো ছোট ছিল না, কখনো বিস্তৃতও হয়নি। এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। কিন্তু মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবল প্রথম এই ধারণা ভেঙে দেন।

তিনি পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে দেখান, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। সময়ের উল্টোদিকে গেলে তাই আমরা দেখতে পাব, এর একটা সূচনা আছে। বিজ্ঞানীরা এই সূচনাকে বলছেন বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ। যার শুরু আছে, তার একসময় শেষও হবে। তবে এই শেষ কীভাবে হবে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত হতে পারেন নি। হাবলের এই অনন্য আবিষ্কারের ফলে আমাদের মহাজাগতিক চিত্রটা বদলে গেল। আমরা জানলাম, এই বিশাল মহাবিশ্বটাও প্রসারিত হচ্ছে। ডার্ক এনার্জি মহাবিশ্বের প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে। এ শক্তির কারণে গ্যালাক্সিগুলি একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা মহাবিশ্বকে আরও গতিশীল করে তোলে। মহাবিশ্বে তাই কিছুই স্থির নয়। গ্রহ ঘুরছে কোনো এক নক্ষত্রকে ঘিরে, উপগ্রহ ঘুরছে গ্রহকে ঘিরে। নক্ষত্র ঘুরছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে ঘিরে। অনেকগুলো গ্যালাক্সি একসঙ্গে মিলে তৈরি করে গ্যালাক্সিপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার। এই পুঞ্জের কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরে চলে গ্যালাক্সিগুলো। আবার অনেকগুলো ক্লাস্টার মিলে যে সুপারক্লাস্টার তৈরি করে, তার কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরে চলে ক্লাস্টারগুলো।

বিশাল পরিসরের হিসাব এসব। কিন্তু পরিসরে অণু-পরমাণুর কথা যদি ভাবি, এগুলোও সবসময় কেবল ছুটছে। প্রশ্ন হলো, কেন? কেন মহাবিশ্বের সব কিছু গতিশীল? কারণ আর কিছু নয়, মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বল। এই বলগুলোই মহাবিশ্বের সব কিছুকে সব সময় ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। মূলত মহাকর্ষ বল বড় বস্তুগুলোকে সব সময় গতিশীল রাখে। আর তড়িৎচৌম্বকীয় বল, শক্তিশালী ও দুর্বল নিউক্লিয় বল গতিশীল রাখে অতিপারমাণবিক কণাদের।

মহাকর্ষ বলের কারণে বড় বস্তুগুলো একে অন্যকে আকর্ষণ করে। এ কারণেই গ্রহেরা নক্ষত্রকে ঘিরে ঘোরে, আবার নক্ষত্ররা ছুটে চলে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে ঘিরে। আর তড়িৎচৌম্বকীয় বলের কারণে কণাদের মধ্য দিয়ে ভরবেগ স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তার চারপাশে ঘোরে। আবার এ কারণেই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে – কারণ ধনাত্মক চার্জ আকর্ষণ করে ঋণাত্মক চার্জকে। তবে কণারা মিলে যে বড় বস্তু তৈরি করে, তার ওপরেও রয়েছে তড়িৎচৌম্বকীয় বলের প্রভাব। এর ফলে বড় বস্তুরা টান বা ধাক্কা অনুভব করে (ভরবেগের স্থানান্তরের ফলে)। বিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন যে কোনও বস্তু একবার গতি পেলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না হলে তার প্রতি অব্যাহত থাকে, সে সমবেগে সরলরেখা বরাবর গতিশীল থাকে। মহাবিশ্বের গতিশীল অবস্থা সেই প্রাকৃতিক গতিসূত্রেরই প্রতিফলন।

আবার এদিকে প্রতিটি পরমাণুর ভিতরে শক্তিশালী নিউক্লিয় বলের কারণেই পরমাণুর নিউক্লিয়াস অক্ষত থাকে। আর দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের জন্য প্রোটন বিটা ক্ষয়ের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে নিউট্রনে। আবার উল্টোভাবে নিউট্রন ভেঙে একটি প্রতিনিউট্রিনো, একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে নিউক্লিয়াসের ভেতরে। এভাবেই গতিশীল থাকে মহাবিশ্বের ছোট-বড় সব কিছু। ■

চয়ন ঃ

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

মেঘনাদ সাহা

[বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা আজ থেকে ৭৫ বছর আগে হিন্দুধর্ম তথা অন্যান্য ধর্মে বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে যে প্রচার আছে তা এই প্রবন্ধে খন্ডন করেছিলেন। এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পুনরায় প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক, সমীক্ষণ। ২৭শ বর্ষ – ২য় খণ্ড –৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন – ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষ পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।]

"সবই ব্যাদে আছে।"

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে "সবই ব্যাদে আছে" এইরূপ লিখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি 'বেদের' প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটার প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of Ionisation of Elernents দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।" আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, 'মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন্ অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?' তিনি বলিলেন, "আমি ত কখনও 'ব্যাদ' পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞান যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে।" অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।

এই শ্রেণীর লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ সমালোচক অনিলবরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি 'বেদ' মূলে না হউক, অনুবাদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অপজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি "সবই ব্যাদে আছে" এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কি আছে?

এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ – আঠার বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলা বাহুল্য, বেদ বলিতে এস্থানে আমি ঋগ্বেদই বুঝিয়াছি। পরে ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদে "ঋগ্বেদসংহিতা" পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধ হয় মূল 'বৈদিক সংস্কৃতে' বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান (সাধনভাষ্য)। কিন্তু প্রধানত

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অংশসমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারণ অনেক – একটা প্রধান কারণ এই যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত তত্ত্ব এবং যে সময়ে যে দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণীর লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের back ground না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তীদিগকে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, 'বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল?' বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের' সময় নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ, যাঁহারা এককালে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটাকেই খ্রীষ্টীয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতম ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতি মাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খৃঃ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খৃঃ অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০৪০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খৃঃ-পূঃ ৪২০০ অব্দ পর্য্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে মিশরে পিরামিড্ ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খৃঃ-পূঃ ২৬০০ অব্দে ইরাক্ দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভব খৃঃ-পূঃ ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ বেবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রযোগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক্ ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাসু যে, 'বৈদিক সভ্যতা' এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদান প্রদান ছিল কিনা? – বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫০ পূঃ-খৃঃ অব্দের মিটানীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজগণ আধুনিক মোসাল্ (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিশরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিটানীয়গণ, ইরানিয়ান্ অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ – সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবত কাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালের তুর্কীদের বা মধ্যএশিয়াবাসীদের মত তাঁহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এথিমিনীর বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দরায়াধুস্) ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ ৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে তাঁহাদের অনুশাসন পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ বিশেষত সীরিয়া দেশ প্রচলিত Aramaic লিপি। ১৪৫০ খৃঃ-পূৎ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (Cuneiform) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি (script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্জন করিয়াছে? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবীলিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় তুর্কী বা হুন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীনলিপি,

পারস্যে ফারসীলিপি এবং রুশিয়াতে Cyrilic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতভর্ষেও বর্ত্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদাদির উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোন উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায় – যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলোন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে অথর্ববেদ ১৫০০-১৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলোনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদ নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত ঋষিগণ কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীর সমষ্টি মাত্র। অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রাদি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসা ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শ সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা 'রা' দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Sirius তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমন্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাঁহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহনক্ষত্রাদিমূলক । যেমন –

An or Anu আকাশ বা দৌ; Shamash বা Babbar-সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতা; Sin বা Nannar-চন্দ্র; Istar - সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা শনিগ্রহ; Ncrgal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং British Museum-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর গ্যাড্ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্টীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীও Egyptian Book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টড্ তাঁহার Dawn of Conscience in the World এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বাইবেল্ এ যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বাণীকে যীশু খৃষ্টের মুখনিসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভারত নয়, এমন কি, অক্ষরতও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ৪০০০ খৃঃ-পূঃ অব্দ হইতে ৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটী সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাঁহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় ধর্মের 'আধ্যাত্মিকতা'র ভিত্তি গঠন করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্ম্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদী-পর্বতাত্মক 'দেবতাসমূহ' নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরে ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহুদেবতার উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সময় (খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতা ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটা বা তিনটা বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, পরবর্তী যুগে (অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের– লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই ২২০০ বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে (আনুমানিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; উপনিষদের 'আধ্যাত্মিকতা' ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ 'বেদকে' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাঁটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদ বিরোধী। যেমন ধরা যাউক্ সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।"

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধপ্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত 'মত' অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষের ও অভ্রান্ত এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাৎ পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন মতই বেদকে "অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত" প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারণ কি? যাঁহারা বেদমত বিরোধী তাঁহারাও বেদের দোহাই দেন কেন? একথার উত্তর আর একটি ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলামধর্ম – যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহম্মদ 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ। কিন্তু হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইস্‌লাম জগতের বিভিন্ন অংশে কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা বা ইস্‌লাম জগতের অধিনায়ক ছিলেন ওস্‌মান। খলিফা ওস্‌মান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইস্‌লাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতীকারকল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মোহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের একটী বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের রচনাবলী বাস্তবিকই হজরতের মুখনিসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'কোরাণের' পাণ্ডুলিপি করিলেন এবং নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইস্‌লাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইস্‌লাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক। কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইস্‌লামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে ৭২টি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষের (অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের মুখনিসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার ব্যবহারে অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণসঙ্গত' নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজীল সম্প্রদায় হইতে (যাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টট্‌ল প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন) আগা খানী সম্প্রদায় পর্য্যন্ত (যাঁহারা অবতার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান্) সমস্ত পর্য্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন। তাহার কারণ, ইস্‌লামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সীরিয়া, পারস্য, ইরাক্, মধ্যএশিয়া ইত্যাদি নানা দেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেকস্থলে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মদর্শনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইস্‌লামীর ধর্মতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইস্‌লামধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত সাহসও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া, তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরানবিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণ করেন।

'বেদের অভ্রান্ততার' সম্বন্ধেও এই বক্তব্য চলে। বৈদিক আর্যগণ যখন ২৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর-ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজগণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন। পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত, গণিত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এদিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অন্যপ্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান্, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাঁহারা বেদের অস্পষ্ট সুক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক 'শিব পশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেকস্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাঁহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কথা উঠিতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে সমস্ত জাগতিক তথ্য (world-phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিরূপে 'বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির' ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব একাদশ অংশ)

শক্তির ফোটন ধারণা ছিল নিলস্ বোরের স্বীকার্যের ভিত্তি। এই ফোটনে শক্তির পরিমাণকে প্লাঙ্ক ধ্রুবক এবং কম্পাঙ্কের গুণফলরূপে প্রকাশ করে শক্তির কণা ধর্ম এবং তরঙ্গ ধর্মকে একীভূত করা হয়েছিল। এই একীকরণ কিভাবে পরমাণুর নবতর ধারণাকে গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল তা এবার চর্চা করা যাক।

নিলস্ বোরের এই স্বীকার্যে (১৯১৩ খ্রিঃ) আলোর কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম – উভয়ের একত্রে উপস্থিতি গ্রাহ্যতা পেয়েছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে প্রকৃতির এতদিনকার অনাবিষ্কৃত এই বৈশিষ্ট্যকে (কণা তরঙ্গ দ্বৈত ধর্ম) জানার পর একইভাবে ব্যাখ্যা করা গেছিল। বস্তুকণার ক্ষেত্রে এমন দ্বৈত চরিত্র আবিষ্কার তখনও হয়নি।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে (১৯০৫ খ্রীঃ) আমরা জেনেছি বস্তুর ভরের শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। এটা ছিল বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ কিন্তু এই সমীকরণটি প্রকৃতপক্ষে ছিল

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

এখানে বস্তুর স্থির ভর, (m) শক্তি (E)-তে রূপান্তরিত হওয়াকে দুটি সাপেক্ষ কাঠামোর একটি থেকে অন্যটিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যেখানে একটি সাপেক্ষ কাঠামোর সাপেক্ষে অপরটি v গতিতে গতিশীল। যখন এই গতিবেগ $v = o$ অথবা খুবই ক্ষুদ্র মানের হয়, তখন বলা যায় $E = mc^2$ [যেখানে $c =$ শূন্যমাধ্যমে আলোর গতিবেগ] শক্তির এই ভরে রূপান্তরের পাশাপাশি শক্তির কণা ধর্ম ও তরঙ্গধর্ম একত্রে অবস্থান দেখে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই ডে ব্রগলি (Louis de Broglie) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাব করলেন বস্তুকণারও কণাধর্মের পাশাপাশি আছে তরঙ্গধর্ম।

ইতিমধ্যে ১৯১৩ খ্রিঃ স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন বর্ণালী (বামার সিরিজ) থেকে দেখা গেছে ৬৫৬.৩ ন্যানোমিটারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল বর্ণের রেখা ৪৮৬.৩ ন্যানোমিটারের নীল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই নিয়ম বাকি অংশে এমনকী লিম্যান সিরিজ, প্যাসেন সিরিজ, ব্র্যাকেট সিরিজ, ফুন্ড সিরিজ, হামফ্রিজ সিরিজ – সব ক্ষেত্রে একইরকম দেখা গেছে। যদি বামার সিরিজ থেকে প্রাপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (λ) ও শক্তি স্তরের (n) সমীকরণ দেখি, তবে তা লিম্যান সিরিজ, প্যাশেন সিরিজ, ব্র্যাকেট সিরিজ – সবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বামার সিরিজ অনুসারে $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$,

যেখানে $n = 3, 4, 5...$

লিম্যান সিরিজ অনুসারে $= R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right)$,

,, $n = 2, 3, 4, ...$

প্যাশেন সিরিজ অনুসারে $= R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right)$,

,, $n = 4, 5, 6, ...$

ব্র্যাকেট সিরিজ অনুসারে $= R\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right)$,

,, $n = 5, 6, 7, ...$

ফুন্ড সিরিজ অনুসারে $= R\left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right)$,

,, $n = 6, 7, 8, ...$

[এখানে $R =$ রিডবার্গ ধ্রুবক। প্রতিটি বর্ণালী থেকে প্রাপ্ত সিরিজ বিজ্ঞানী বামার, লিম্যান, প্যানেশ, ব্র্যাকেট এবং ফুন্ডের যথাক্রমে নামাঙ্কিত। এখানে λ বিকিরিত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।] এই বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন রঙে বর্ণালীতে থাকে। এই বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নির্দিষ্ট গুণ (এখানে বর্ণালীর শক্তি) নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হলেই তার গুণ (অর্থাৎ রঙ) পাল্টায়। বিষয়টা বোঝার স্বার্থে একটা অন্য উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক এক ব্যক্তি তার উচ্চতার দেড়গুণ গভীর এক গর্তে পরে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করছে লাফিয়ে উপরে ওঠার জন্য। কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই উপরে উঠতে পারছে না। যখন সে এমন শক্তিতে লাফ দিল যে একেবারে নিজের উচ্চতার দেড়গুণ

উচ্চতা পার করা গেল, তখনই সে উপরে উঠতে সক্ষম হল। এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরত শক্তির ক্ষেত্রেও বিষয়টা অনেকটা এইরকম। তাই বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের আলোর রেখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। একে বলা হয় রেখা বর্ণালী। শক্তি (সে তরঙ্গ হোক বা কণা যে রূপেই বিচার করা হোক) পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে নতুন গুণ অর্জন করে (রঙ পাল্টে যায় বা তার কাজকর্মও পাল্টে যায়)।

বিকিরিত শক্তিকে ফোটন কণারূপে বিচার করলেও একই ব্যাখ্যা করা যাবে যেখানে পরিমাণের পরিবর্তন ধরা হবে আপাতিত ফোটনের কম্পাঙ্কের দ্বারা।

আইনস্টাইনের ঐ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আপেক্ষিক ভরবেগ (relativistic momentum) এর যে ধারণা পাওয়া যায় সেই অনুসারে ভরবেগ $\rho = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ আবার আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া অনুসারে একটি ফোটনের ভরবেগ $p = \frac{h}{\lambda}[h = \text{প্লাঙ্ক ধ্রুবক}]$ বা $\lambda = \frac{h}{\rho} = \frac{h}{mv}$

$[m = \text{যে সাপেক্ষ কাঠামো স্থির সেখানে প্রাপ্ত ভর } (rest\ mass), v = \text{বস্তুর গতিবেগ}]$ বিজ্ঞানী লুই ডে ব্রগলি প্রস্তাব করলেন যে এই সমীকরণ ফোটন কণার মতো বস্তুকণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে তখন সমীকরণটি হয়ে ওঠে $\lambda = \frac{h}{mv\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}$

$[v$ বেগে দ্বিতীয় সাপেক্ষ কাঠামো প্রথম সাপেক্ষ কাঠামো সাপেক্ষে গতিশীল $]$

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তার তরঙ্গ এবং কণা ধর্ম কখনোই একত্রে একসময় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বস্তু কণার ক্ষেত্রেও একইসময় একত্রে কণা ধর্ম ও তরঙ্গ ধর্ম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুকণার তরঙ্গরূপ ঃ জলের ক্ষেত্রে ঢেউ বা তরঙ্গ হল কিছু বস্তু (এখানে জল) ক্রমান্বয়ে পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি। শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে একে চাপ বলা যায়। আলোর ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ক্রমপরিবর্তন। কিন্তু বস্তুকণার তরঙ্গের ক্ষেত্রে কিসের ক্রমপরিবর্তন হচ্ছে? যে পরিমাণটির ক্রমপরিবর্তন এখানে হচ্ছে, তাকে বলা হয় ওয়েভ ফাংশান। একে গ্রিক অক্ষর সাই $[\psi]$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো গতিশীল বস্তুর সঙ্গে থাকা (associated) ওয়েভ ফাংশান কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে যা হবে, তাই তার সেই স্থান-কালে অবস্থান। এই নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে বস্তুকণাটিকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্যতাকে $|\psi|^2$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, একে বলা হয় প্রবাবিলিটি ডেনসিটি।

এই যে সম্ভাব্যতাকে ভিত্তি করে তার অবস্থান নির্ণয়, এটা তার গতিময়তারই পরিচয়। কখনোই স্থির বলা যাবে না কোথায় তার অবস্থান, কেবলমাত্র সম্ভাব্যতা ছাড়া। সম্ভাবনা শূন্য (0) এর অর্থ সেই স্থান ও কালে তাকে নিশ্চিৎ পাওয়া যাবে না। আবার সম্ভাবনা এক (1) এর অর্থ নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাকে সেখানে পাওয়া যাবেই। কিন্তু সম্ভাবনা 0.2 (অর্থাৎ 20 শতাংশ) হলে বলা যায় আশি শতাংশ তাকে সেই সময় সেখানে না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ মোটামুটি সে সময় সেখানে থাকবে না।

এই প্রবাবিলিটি ডেনসিটি, যাকে $|\psi|^2$ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে এই ওয়েভ ফাংশান দ্বারা বস্তুর সম্ভাব্য স্থান-কালে উপস্থিতি $|\psi|^2$ এর সঙ্গে সমানুপাতিক। এর সঙ্গে আলোর কণা প্রকৃতি ও তরঙ্গ প্রকৃতিকে ডবল স্লিট পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্যের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই পরীক্ষায় আলোকে তরঙ্গরূপে বিবেচনা করলে আলোর তীব্রতা পর্দায় নির্ভর করে তড়িৎ ক্ষেত্রে গড় তাৎক্ষণিক তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির মানের বর্গের উপর। আলোকে ফোটন কণার স্রোত ধরলেও পর্দায় কোথাও ফোটন কণার উপস্থিতির সম্ভাবনাও ঐ তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির মানের বর্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাওয়া যায়।

এই ওয়েব ফাংশান সম্পর্কে এক্স রশ্মির ডিফ্রাকশনের জন্মদাতা ডব্লু. এল, ব্র্যাগ বলেছেন – "The dividing line between the wave and particle nature of matter and radiation is the moment 'now'. As this moment steadily advances through time it coagulates a wavy future into a particle past ... Everything in the future is a wave, everything in the past is a particle."

ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় – **"পদার্থের এবং শক্তির (বিকিরণের) তরঙ্গ এবং কণা প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্যকারী রেখা হল সেই মুহূর্তে 'এখন'। যত এই মুহূর্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সময়ের সাথে এগোয়, তত সে এক তরঙ্গায়িত ভবিষ্যৎকে জড়ো করে অতীত কণারূপে ... ভবিষ্যতের সব কিছুই তরঙ্গ, অতীতের সব কিছুই কণা।"**

বিজ্ঞানী ব্র্যাগের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা না করে এক দিনেমারের থিয়োলজিস্ট দার্শনিকের জীবন সম্পর্কে মন্তব্যে এর অর্থ খোঁজা যাক। দার্শনিক সোরেন কিয়েরকেগার্ড (Soren Kierkegaard) বলেছিলেন –

'Life can only be understood backwards, but it must

be lived forwards.' অর্থাৎ যা কিছু হয়ে গেছে তা ঘটার কোনো সম্ভাবনা আর নেই। তবে খুঁটিনাটি চর্চা, বিশ্লেষণ, সমালোচনা একটা নির্দিষ্ট মূল্যায়নে এনে আমাদের দাঁড় করায়, সেটার আর কোনো সম্ভাব্য পরিণতি নেই। কারণ ইতিমধ্যে তা ঘটে গেছে। সেটা কণার মতো **থেমে গেছে**। অথচ যা হয়নি, তার হওয়ার অনেক যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনার কোনো একটা হয়তো ঘটবে, কিন্তু নিশ্চিত নয় কোন্‌টা ঘটবে। সর্বাধিক সম্ভাবনা কি সেটা ছাড়া বলা যাবে না কি ঘটতে পারে। জীবনকে যেভাবে এই দার্শনিক দেখেছেন, বস্তু (Matter) এর কণা প্রকৃতি এবং তরঙ্গ প্রকৃতি অনেকটাই এই রকম। ডে ব্রয়ের ম্যাটার ওয়েভ তত্ত্ব এমনই দার্শনিক সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে এসে ফেলেছে।

ওয়েব ফাংশানকে যে ψ অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তার কোনো ভৌত প্রকাশ (physical interpretation) নেই। **এর অর্থ এই ফাংশান বস্তু কণার যে ধর্মগুলো জানা সম্ভব তাকে এবং যা জানা যায় নি তাকে একত্রে প্রকাশিত করে। আমরা ইতিমধ্যে যাকে জীবনের জানা অতীত এবং অজানা ভবিষ্যতের সমন্বিতরূপ বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।** ফলে এই ফাংশানের অবশ্যই দুটি অংশ (part) থাকবে, একটি অংশ সম্ভাব্য জ্ঞাত, অপর অংশ অজ্ঞাত। এর মানের বর্গ (square of its absolute magnitnde) হল $|\psi|^2$ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে বস্তু কণাটির উপস্থিতির সম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করে। ψ দ্বারা কোনো বস্তুর রৈখিক ভরবেগ, কৌণিক ভরবেগ এবং শক্তির পরিমাণও প্রকাশিত হয়। এই ওয়েব ফাংশানগুলি সাধারণত জটিল অপেক্ষক, এর বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশ রয়েছে। যদিও সম্ভাব্যতাকে বাস্তব হতে হবে। তাই প্রবাবিলিটি ডেনসিটি (অর্থাৎ যেখানে বস্তুকণাটির উপস্থিতি সর্বাধিক)কে নির্ণয় করা হয় $|\psi|^2$ দ্বারা যা কিনা একটি জটিল ফাংশান ও তার কনজুগেটের (সংলগ্ন ফাংশানের) গুণফল। যদি ওয়েব ফাংশানটিকে $\psi = A + iB$ রূপে প্রকাশ করা হয়

[যেখানে A এবং B দুটি বাস্তব ফাংশান এবং

$i = \sqrt{-1}$ জটিল সংখ্যা]

তবে তার কনজুগেট হবে $\psi^* = A - iB$

ফলে $|\psi|^2 = \psi^* \psi = A^2 - i^2 B^2 = A^2 + B^2$

সুতরাং $|\psi|^2$ **সর্বদা ধনাত্মক বাস্তব পরিমাণকে প্রকাশিত করবে।** এই কারণে ওয়েভ ফাংশান থেকে তার সম্ভাব্য উপস্থিতি, ভরবেগ, শক্তির পরিমাণ জানতে $|\psi|^2$ কে ব্যবহার করা হয়।

এই প্রথম বোধ হয় এই রচনায় কোনো কিছুর সম্পর্কে বর্ণনায় এতটা অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব জগৎটা এমনই স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার সমন্বয়। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস লিখেছিলেন **"এটা জানা আছে যে যাকে বলা হয় আবশ্যিক তা কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ এবং তথাকথিত আকস্মিকতা হলো আবশ্যিকতার আত্মগোপনের আবরণ।"**

ওয়েব ফাংশান সম্পর্কে ধারণা আসার অনেক আগে এই মন্তব্য করেছিলেন (থিউলজিস্ট দার্শনিক সোরেন কিয়েরকেগার্ড-এর মতোই অনেক আগে)। কিন্তু প্রকৃতির সাধারণ নিয়মটাই যদি এরকম হয় তবে **আপাত ধূম্রজালে আচ্ছন্ন গতিময় বস্তুজগতের ওয়েভ ফাঙশানও আবশ্যিক বাস্তব ও আকস্মিক অবাস্তবের সমন্বিতরূপই হবে।**

নিলস্ বোরের পরমাণু মডেলের স্বীকার্যের সময় অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রিঃ লুই ডে ব্রগলির বস্তুর কণা-তরঙ্গের তত্ত্বের জন্ম না হলেও সেই স্বীকার্যের মধ্যেই কণাতরঙ্গ (matter wave) ধারণা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। বাস্তবিক বর্ণালী বিশ্লেষণ তাঁকে যে ধারণায় নিয়ে গেছিল, তার ব্যাখ্যাই শুধু করা সম্ভব হয় নি। এরকম একটা উদাহরণ দিয়ে এবারের পর্ব শেষ করবো। আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তনরত ইলেকট্রনের প্রকৃতি অনুধাবন করবো, যে পরমাণুর গঠন থেকে নিলস্ বোর নতুন পরমাণু মডেলের ধারণা দিয়েছিলেন। লুই ডে ব্রগলি বোরের পরমাণু মডেলকে ম্যাটার ওয়েভ ধারণা থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন একদশক পরে। আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি

$$\lambda = \frac{h}{mv.\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}}$$ এখানে $\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ কে

একটি ফ্যাকটর রূপে দেখা হয়। একে গ্রিক γ (গামা) অক্ষর দিয়েও প্রকাশ করার চল আছে। ফলে $\lambda = \frac{h}{mv.\gamma}$ হয়। যেহেতু ইলেকট্রনের গতিবেগ v, আলোর গতিবেগের সাপেক্ষে অনেক কম। অর্থাৎ $v \ll c$, ফলে ইলেকট্রনকে সাপেক্ষ কাঠামো হিসেবে দেখলে $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ সংখ্যাটি ≈ 1 । হবে।

অর্থাৎ এক কথায় $\lambda = \frac{h}{mv}$ হবে।

যে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের সংস্কার সাধনে বোরের স্বীকার্য, সেখানে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রনের বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনরত।

ইলেকট্রনের উপর কেন্দ্রমুখী বল (centripetal force) নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে $F_c = \frac{mv^2}{r}$ [m = ইলেকট্রনের ভর r = ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ, v = ইলেক্ট্রনের রৈখিক বেগ যা আবর্তন পথের স্পর্শক বরাবর ক্রিয়ারত]

আবার ঋণাত্মক আধান সম্পন্ন ইলেকট্রনের প্রতি ধনাত্মক আধান সম্পন্ন নিউক্লিয়াসের তড়িৎ বল (electric force) কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী $F_e = \frac{1}{4\pi \in_0} \cdot \frac{e^2}{r^2}$

[$\in_0$ = শূন্যমাধ্যমের পারমিটিভিটি; e = ইলেকট্রনের চার্জ]

যেহেতু পরমাণুর ভিতর এক গতিশীল সাম্য থাকে, তাই

$$F_c = F_e \; or, \frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi \in_0} \cdot \frac{e^2}{r^2}$$

বা, $$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi \in_0 .mr}}$$

$$\therefore \lambda = \frac{h}{\frac{me}{\sqrt{4\pi \in_0 .m.r}}} = \frac{h\sqrt{4\pi \in_0 m.r}}{me}$$

$$= \frac{h}{e} \cdot \sqrt{\frac{4\pi \in_0 r}{m}}$$

ইতিমধ্যে নিলস্ বোরের স্বীকার্য অনুসারে আবর্তনরত ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ

$r = 5.3 \times 10^{-11} m$

$\in_0 = 8.85 \times 10^{-12} c^2/N.m^2,$

$m = 9.1 \times 10^{-31} kg, h = \text{প্লাঙ্কধ্রুবক} = 6.63 \times 10^{-34} J.s$

$e = 1.6 \times 10^{-19} c$

$$\therefore \lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1.6 \times 10^{-19}} \sqrt{\frac{(4\pi)(8.85 \times 10^{-12})(5.3 \times 10^{-11})}{(9.1 \times 10^{-31})}}$$

$= 33 \times 10^{-11} m$

আবার বোরের মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিধি

$2\pi r = 2 \times (\pi) \times (5.3 \times 10^{-11})$

$= 33 \times 10^{-11} m$, হুবহু ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান। আমরা যদি একটি বৃত্তাকার তারের ফাঁস (wire loop)কে ধরি যা কম্পনরত, তবে প্রতিটি কম্পনজাত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (λ) মোট যোগফল যদি পূর্ণসংখ্যায় হয়, তবে সেই যোগফল ঐ বৃত্তের পরিধির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। [চিত্র-১]

অর্থাৎ এক কথায় নিলস্ বোরের বিচারে যে স্থির বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরছে, তা লুই ডে ব্রগলির একদশক পরের ব্যাখ্যায় পূর্ণসংখ্যার তরঙ্গের সমষ্টি। একারণে তা বিনা শক্তিক্ষয়ে অবিরত সুদুর অতীত থেকে এই মুহূর্ত হয়ে দূর ভবিষ্যতে গতিশীল। একে কেবলমাত্র ওয়েব ফাংশান ψ দিয়েই প্রকাশ সম্ভব।

যে ওয়েব ফাংশান অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতকে তুলে ধরে, সেই ওয়েব ফাংশান যে প্রকৃতির বস্তুজগতের অবিরাম গতিময়তাকেই তুলে ধরবে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ

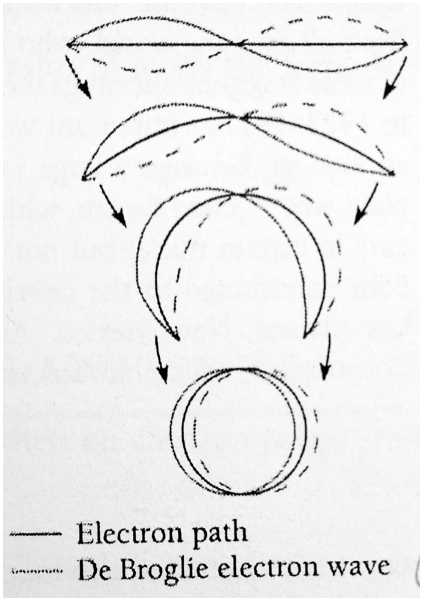

চিত্র-১

নেই। এর গতিময়তায় একদিকে আবশ্যিক নিশ্চয়তা (যাকে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি দিয়ে নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়), অন্যদিকে অজ্ঞাত অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ। এই দুই বিপরীত প্রান্তের সীমা বিন্দু (nodal point) হল এই মুহূর্ত 'এখানে' (now)। এই দুই বিপরীতের সংগ্রাম তাকে সতত গতিময় করে রেখেছে। আবার এই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বিপরীতের ঐক্য ঘটেছে এই মুহূর্ত 'এখন'এ এসে। (ক্রমশ)

সংগঠন সংবাদ ঃ

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবির আন্দোলনে বিজ্ঞান মনস্ক

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্যজুড়ে সংগঠিত গণআন্দোলনে বিজ্ঞান মনস্ক শুরুর দিন থেকেই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শহর কলকাতায় লালবাজার অভিযান, স্বাস্থ্যভবন অভিযান, অনশন মঞ্চ, দ্রোহের কার্নিভাল বা জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের আহ্বানে হওয়া মিছিল, গণজমায়েত, গণকনভেনশন সবগুলিতেই আমাদের সদস্যরা সামিল ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় জুনিয়র-সিনিয়র ডাক্তার বা নাগরিক সংগঠনগুলির ডাকা আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ মিছিল ও অন্যান্য কর্মসূচিতে সাধ্যমত আমরা সামিল থেকেছি। এর পাশাপাশি আমাদের উদ্যোগেও বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়েছে সাধারণ মানুষকে নিয়ে।

গত ২৮শে অক্টোবর সিনিয়র ডাক্তারদের যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যের প্রায় ৮০টি গণসংগঠনের একটি যৌথমঞ্চ হিসাবে 'অভয়া মঞ্চ' গড়ে উঠেছে। পঃ বঃ জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট এই মঞ্চের অংশীদার না হলেও অভয়া মঞ্চের ডাকা প্রতিটি কর্মসূচিতে জুনিয়র ডাক্তারদের বড় অংশ সামিল হচ্ছেন।

অভয়া মঞ্চের ডাকা ৪ঠা নভেম্বর 'দ্রোহের আলো জ্বালো' কর্মসূচিতে বিজ্ঞান মনস্ক রাজ্যের ৬টি অঞ্চলে পালন করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা, গোচরণ (জয়নগর ১ ব্লক) এবং সোনারপুরে; উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ; উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও তার উপকণ্ঠে এবং কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে আমরা এই কর্মসূচি প্রতিপালন করি। কলকাতা, সোনারপুর, গোচরণ ও পাথরপ্রতিমার অনুষ্ঠানে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য ও স্লোগানিং হয়। প্রচুর সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচিতে সামিল হয়ে বক্তব্য রাখেন, স্লোগানিং করেন, সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং কবিতা আবৃত্তি করেন।

৯ই নভেম্বর ছিল অভয়া মঞ্চের ডাকা জনতার চার্জসীট পেশের কর্মসূচি (কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে), বিকাল ৪টা থেকে। এর আগে জুনিয়র ডক্টরস্ ফ্রন্ট কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দেয়। আমরা উভয় কর্মসূচিতে দলবদ্ধভাবে সামিল হই।

১৪ই নভেম্বর কলকাতার বেহালা প্রতিবাদী মঞ্চের ডাকে রাত দখলের তিনমাসে 'দ্রোহকালের শপথ' অনুষ্ঠান হয় এস বি পার্ক বেহালা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে। শীলপাড়া থেকে মিছিল করে সভায় সকলে জমায়েত হন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আমাদের কর্মীরা এই কর্মসূচিতে সামিল হন।

১৭ই নভেম্বর অভয়া মঞ্চের আহ্বানে '১০০ দিন বিচারহীন' কর্মসূচি প্রতিপালিত হয়। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছিল সোদপুর থেকে শ্যামবাজারে সাইকেল মিছিল এবং শ্যামবাজারে মশাল মিছিল। এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সারা রাজ্যে হওয়া '১০০ দিন বিচারহীন' অনুষ্ঠানেও আমরা অংশগ্রহণ করেছি কয়েকটি অঞ্চলে। ■

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন

অক্টোবর সর্বহারা সমজাতান্ত্রিক বিপ্লব উদ্‌যাপনের আয়োজক কমিটির অংশীদার হিসেবে আমাদের সংগঠন প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যৌথভাবে এই দিবস উদ্‌যাপন করেছে, অন্যান্য শ্রমিক-ছাত্র-গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারপত্র বিলি, পোস্টারিং এবং পথসভা করেছে অন্য সংগঠনগুলির সঙ্গে।

৭ই নভেম্বর কলকাতার বেহালা অঞ্চলে **'নারীমুক্তি ও অক্টোবর বিপ্লব'** শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ১২ জন দর্শক তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন। অভয়ার ন্যায়বিচার নিয়ে যে গণআন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও ন্যায় বিচার মিলবে কিনা এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। একজন প্রতিনিধি বলেন যে আমরা মহিলারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নির্যাতিত, অবহেলিত। সুবিচার কোন দিনই মেলেনি। এই আন্দোলনে সরকারের ভূমিকা, কোর্টের ভূমিকা বেদনাদায়ক। তবে একটা আশার কথা – আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কথা বলার একটা মঞ্চ পেয়েছি। অধিকার আদায় করতে ১০০ বছর লাগলে লাগুক। আমরা লড়াই করব। এই আন্দোলন শুধু নারীমুক্তির জন্য নয়, সমাজের মুক্তির লড়াই।

সংগঠনের পক্ষ থেকে মানব সমাজে নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের কারণ এবং সমাজ বিকাশের ধারায় নারীমুক্তির পথ নিয়ে চর্চা হয়। বক্তারা বলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নারী পরাধীন হয়েছে এবং শ্রেণীশোষণের অবসানের পথেই নারীমুক্তি একমাত্র সম্ভব। অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রুশী তথা সোভিয়েত জনগণ নারীমুক্তির জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে নারীমুক্তির সূচনা হয়েছিল তা বিস্তারিত উদাহরণ সহযোগে ব্যক্ত করেন। সবশেষে আয়োজক কমিটির প্রতিনিধি আয়োজক কমিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরেন। ■

কুসংস্কার বিরোধী প্রচার

গত ৩০শে অক্টোবর উত্তর ২৪ গরগণার বনগাঁ শহরে সমাজে টিকে থাকা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় শাখা গণসচেতনামূলক কর্মসূচি পালন করে। ■

কবিতা ঃ

দ্রোহ

– তন্ময়

রাজপথে সংগ্রামে একসাথে দাঁড়িয়ে
বুকে বারুদ, হাতে মশাল, শির আকাশ ছাড়িয়ে
শাসকের রক্ত চোখ, আমরা আর পাইনা ভয়
আজ শপথ, ছিনিয়ে নেব তিলোত্তমার জন্য জয়,
চলছে মিছিল, উঠছে স্লোগান
মাটির 'পরে তপ্ত শ্বাস
চার দেওয়ালের বাঁধন ভেঙে
গড়ব মোরা ইতিহাস,
লড়ছি মোরা উঠছে ঢেউ দিকে দিকে লক্ষ্য স্থির
শত্রুশিবির গুঁড়িয়ে দেব এক নিমেষে, আমরা বীর।
দিন শেষে রাত জেগে থাকব সব পাহারায়
পথ কঠিন হোক তবু ফুটবে ফুল সাহারায়
অনুভবে কলরবে ধারালো হবে ভোঁতা বোধ
জাগছে মানুষ চারপাশেতে হচ্ছে সরব প্রতিরোধ
মৃত্যুবরণ করতে পারি
তবু মোরা থামব না
কাঁদানে গ্যাস, জলকামান
ব্যারিকেড মানব না,
ঘেন্না ক্রোধে প্রবল দ্রোহে বিশ্বজুড়ে আগুন ঝড়
মাটির সাথে মিশিয়ে দেব বাস্তুঘুঘুর
আঁতুড়ঘর।

১৫ই অক্টোবর, দ্রোহের কার্নিভাল

৪ঠা নভেম্বর, বেহালায় দ্রোহের আলো জ্বালো

৯ই নভেম্বর, কলেজ স্কোয়ার থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

৪ঠা নভেম্বর, পাথরপ্রতিমায় দ্রোহের আলো জ্বালো

৭ই নভেম্বর, বেহালায় অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন

৪ঠা নভেম্বর, সোনারপুরে দ্রোহের আলো জ্বালো

৪ঠা নভেম্বর, বনগাঁয় দ্রোহের আলো জ্বালো

১৫ই অক্টোবর দ্রোহের কার্নিভালে বিজ্ঞান মনস্ক

৩০শে নভেম্বর সোনারপুরে আলোচনা সভা
আর জি কর কান্ড ও নারীমুক্তি

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.org